একা অন্য

অনিরুদ্ধ বসু

Aditi

একা অন্য

অনিরুদ্ধ বসু

Aditi

একা অন্য

অনিরুদ্ধ বসু



স্মৃতি পাবলিশার্স

Eka Onyo

A Bengali Novel by ANIRUDDHA BOSE

Published by **SMRITI PUBLISHERS**

Website: www.smritipublishers.com

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০২০

প্রথম ই-বুক প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০২০

প্রচ্ছদপটঃ অদিতি চক্রবর্তী

অলংকরণঃ অনিরুদ্ধ বসু

প্রকাশকঃ

স্মৃতি পাবলিশার্স

“ওয়েসিস” সি এফ - ৪১

সেক্টার ১

সল্ট লেক সিটি

কলকাতা ৭০০০৬৪

ISBN No: 978-81-948003-3-0

উৎসর্গ

লেখার জন্য যে আমায় অফুরন্ত অবকাশ দিয়েছে
আমার স্ত্রী **স্মৃতি বসুকে**

যাদের সহযোগিতা এই লেখাকে সমৃদ্ধ করেছে

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

অনিরুদ্ধ বসুর উপন্যাস মানেই নতুন কিছু চমক, ফর্ম নিয়ে ভাঙাচোরা করে নতুন কোনও ফর্ম বা ফর্মলেস এনটিটি, নতুন কোনও চিন্তার ঝলক, প্যারাডাইমের আপাত-স্বাচ্ছন্দ্যের বাইরে গিয়ে নতুন কোনও চোখে জীবনকে দেখা।

অনিরুদ্ধর নতুন উপন্যাস **'একা অন্য'** পড়তে গিয়ে পাঠক একটু মানসিক হোঁচট খেতে পারেন, এই বিধিসম্মত সতর্কীকরণটি করে রাখাই ভালো। উপন্যাসটি নতুন ফর্মে লেখা - মোনলোগ। ইংরেজি ভাষায় মোনলোগ-ভিত্তিক উপন্যাস থাকলেও (তার একটি বিখ্যাত উদাহরণ হল জেমস জয়েসের অসাধারণ উপন্যাস Ulysses) বাংলায় সম্ভবত নেই। সেই হিসেবে অনিরুদ্ধকে এ-ব্যাপারে পথিকৃৎ বলা চলে।

উপন্যাসটির প্রটাগনিস্ট একজন নারী নিজের জীবনের অবরোহণ, আরোহণ এবং উত্তরণের কাহিনি বলে গেছে স্বগতোক্তির মতো। যদিও একটি মানুষের জীবনকে এইভাবে অবরোহণ, আরোহণ এবং উত্তরণ এই তিনভাগে ভাগ করে সেই গল্প বলার স্টাইলটা নতুন নয়, কিন্তু লেখক এই অবরোহণ, আরোহণ এবং উত্তরণকে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন। অবরোহণ পর্বে নবরসের উপর ভিত্তি করে উপন্যাসটির প্রটাগনিস্ট অভিশ্রীর জীবনের কালো সময়কালের পর্যালোচনা করা হয়েছে। আরোহণ পর্বে আবার একটি চমক - অভিশ্রী বৌদ্ধ দর্শনের অষ্টমাঙ্গিক মার্গকে আঁকড়ে ধরে তার জীবনের অন্ধকার থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার লড়াই করছে। আর উত্তরণ পর্বে দেখা যাচ্ছে সে মাণ্ডুক্য উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার আলোয় নিজের জীবন দর্শন গড়ে নিজের জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেয়েছে।

জনান্তিকে হবু পাঠকদের জানাই, 'নব-রস', 'অষ্টমাঙ্গিক মার্গ'বা 'মাণ্ডুক্য উপনিষদ'শুনে আতঙ্কিত বা শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। লেখকের গল্প বলার ধরনটা এমনই যে পাঠক বুঝতেই পারবেন না কখন গল্পের প্রটাগনিস্টের অবরোহণ, আরোহণ এবং উত্তরণের কাহিনি একটি মেয়ের জীবনের গণ্ডি ভেঙে একজন জেন্ডার-বিহীন 'মানুষ'-এর জীবনের অবরোহণ, আরোহণ এবং উত্তরণের কাহিনি হয়ে উঠেছে, যে 'মানুষ'-টি পাঠক নিজেও হতে পারে।

আমরা নিজেদের জীবনে ইঁদুর দৌড়েই ব্যস্ত থেকে পরমায়ুটা শেষ করে ফেলি। নিঝুম সন্ধ্যায় কুলায়ে ফেরা পাখির ঝাঁকের কাকলি না শুনে লাইট জ্বেলে ঘরে ঢুকে টিভির সামনে বসে পড়ি। গভীর রাতে রাত জাগা কালপুরুষের একাকীত্বের যন্ত্রণা বা অ্যানড্রোমিডা গ্যালাক্সির আড়াই মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূর থেকে ছুটে আসা আলো কী খবর বয়ে নিয়ে এল, তা বোঝার চেষ্টা না করে ঘর অন্ধকার করে ঘুমিয়ে পড়ি। ধ্রুবতারার অচলতা আমাদের সেই সত্ত-রজ-তমর ওপারের অব্যয় অচল অদৃশ্য মহাশক্তির কথা মনে করায় না, আমরা ধ্রুবতারা না চিনেই জীবন কাটিয়ে দিই।

তবে সবাই নয়। হয়ত বা কোটিতে গুটিক কয়েকজন আছে যারা মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে পাশ ফিরে না শুয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে ওঠে ''আমি তো তোমাদেরই সন্তান, সুপারনোভার বিস্ফোরণে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া তারাদের ধুলো থেকেই তো আমার এই নশ্বর দেহটার সৃষ্টি। কিন্তু বায়োকেমেস্ট্রি কবে কীভাবে বায়োলজি হয়ে গেল, আর সেই বায়োলজির স্থূল দেহটার মধ্যে কখন কীভাবে চেতনা জেগে উঠে পান্নাকে সবুজ আর

চুনীকে লাল বলতে শেখাল? কখন আমাকে প্রশ্ন করতে শেখাল, কে আমি? কোথায় ছিলাম, আর কোথায় যাব? আর তার চেয়েও বড় কথা, কেন এলাম? কে বলে দেবে?''

'একা অন্য'-এর প্রটাগনিস্ট সেই কোটিতে গুটিকের একজন। সে ভাবে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে। সে নিজেকেই প্রশ্ন করে এই জীবনের আসল অর্থটা কী? তাই সে একা। তাই সে অন্য।

পাঠকরা এই অনন্য **'মানুষ'**-টির সঙ্গে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে ডুবে যাবেন নিজের ভিতরে, হয়ত বা **'জোহারি উইন্ডো'**-র গোপন **'C'**জানালা পেরিয়ে গভীর রহস্যময় **'D'**জানালাটির দিকে।

আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়

দুর্গাপুর
সেপ্টেম্বর, ২০২০

আমার কথা

উপন্যাস লেখার ছন্দে যেমন সুর-তাল-লয় আবশ্যক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-বর্ণ সম্ভারে তেমন বৈচিত্র্যের মাধুর্যও। নিজের প্রচলিত লেখাকে বারবার ভেঙে তাই নতুন নতুন উপঢৌকনে হাজির করার চেষ্টা করি। লেখা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট। সময়ের ব্যাপ্তিতে যে সব টিকবে এমন আশা নিয়ে নয়।

তবুও...

লেখা তুমি আত্মদহনে জ্বলো

যদি নতুন সুরে নতুন তানে

না কিছু বলতে পারো।

বেশ কয়েকটা ইংরেজি বৈজ্ঞানিক রহস্য উপন্যাস লেখার পর আবার মাতৃভাষায় প্রত্যাবর্তন। এবার একটা লিরিক্যাল উপন্যাস নিয়ে। লিরিক্যাল উপন্যাস যে আগে লিখিনি, এমন নয়। **দেখা, তোমাকে... ক্যানভাসের** পর এবার নতুন ছন্দে। মনোলগ ফরম্যাটে। জানি না, বাংলা সাহিত্যে এই ফরম্যাটে এর আগে কেউ লিরিক্যাল উপন্যাস লিখেছে কি না। এটাও আরেক এক্সপেরিমেন্ট। উপন্যাসের স্বাভাবিক ফরম্যাট ভেঙে পদ্য-গদ্য মিশিয়ে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

উপন্যাসটি তিনটে অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমটি অবরোহণ নব-রসের সুরে জীবনের পর্যালোচনা। দ্বিতীয়টি আরোহণ যা অষ্টমাঙ্গিক মার্গের আধারে লেখা। এবং অবশেষে উত্তরণ মাণ্ডুক্য উপনিষদের বারোটি শ্লোকের ব্যাখ্যার শেষে আমার জীবন দর্শন।

বাংলা উপন্যাসের পাঠক এমনিতেই কমে গেছে। চিন্তাশীল পাঠকের সংখ্যা আরও কম। তাই উপন্যাসের বিক্রির কথা চিন্তা না করে কেবল সৃষ্টির আনন্দেই এ লেখা। নতুন কিছু বলব বলে...

সময়ের ধোপে এর স্থান কোথায়, সময়ই বিচার করবে। সৃষ্টিকার কখনও পরিণতির কথা ভেবে লেখে না। কেবলমাত্র নিজেকে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করার তাগিদে, সৃষ্টির আনন্দে। এই নতুন নতুনভাবে প্রকাশই তার উদ্ভাবনী মৌলিক সৃষ্টি।

এ বছরের জন্মদিনে এটাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

অনিরুদ্ধ বসু

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০

অনিরুদ্ধ বসু সম্বন্ধে কিছু কথা...



পেশায় প্লাস্টিক সার্জেন, নেশায় লেখক অনিরুদ্ধ বসুর জন্ম **১৯** সেপ্টেম্বর **১৯৫৫** কলকাতায়। বি ই কলেজের স্নাতক ইঞ্জিনিয়ার বাবা স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্র মোহন বসু ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রৌপ্য পদক প্রাপ্ত বাংলার স্নাতকোত্তর মা স্বর্গীয় ইলা বসু-র উৎসাহে ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ। পরে ইউনাইটেড কিংডমের রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেনস থেকে এফ আর সি এস। ইংল্যান্ডে বহু বছর কাটিয়েছেন। দু-বছর মধ্য প্রাচ্যেও। এখন কলকাতার প্রখ্যাত প্লাস্টিক সার্জেন। দেশে ও বিদেশে অন্যতমদের মধ্যে একজন।

ছোটবেলা থেকেই লেখায় আসক্তি। স্কুল পত্রিকা **'নিহিল উল্ট্রার'** সম্পাদক পদের দায়িত্বে থাকাকালীন নিয়মিত সাহিত্যচর্চা। বহু পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি। পরে ইংল্যান্ড ও কুয়েতে সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ।

নিয়তি কেন বাধ্যতে। অনেক সময় নিয়তি বিভিন্ন আঙ্গিকে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ব্যস্ততার মধ্যে ২০০৬ শালে পায়ের হাড় ভেঙে ছ'মাস হুইলচেয়ারে থাকাকালীন সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় পুনরায় লেখালেখি শুরু। সেই সময় **'অন্বেষণ'** উপন্যাস রচনা। যা প্রকাশিত হয় ২৫ আগস্ট ২০০৭-এ। নতুন আঙ্গিকের এই উপন্যাস সাড়া ফেলে দেয় সংস্কৃতি মহলে। বেস্টসেলার শুধুই হয়নি, ব্যস্ত প্র্যাকটিসের মধ্যেও লেখায় অনুপ্রেরণা জোগায়। দ্বিতীয় উপন্যাস **'নিঃশব্দে**ও বেস্টসেলারের খাতায় নাম লেখায়। শুধু তাই নয়, লন্ডন বুক ফেয়ার ও জাতীয় মাধ্যমে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। ভবিতব্য নতুন সৃষ্টির দিক খুলে দিগন্তে নতুন দিশার আলো দেখায়। বহু দেশ থেকে সংগৃহীত মানুষ, সমাজ, উপলব্ধি বন্দি হয় তার লেখনীর বিভিন্ন আঙ্গিকে। ব্যস্ততার মধ্যেও সময় খুঁজে নেয় নতুন চেতনার রচনাশৈলীতে। খুনের গল্পের বিবর্তন থেকে বৈজ্ঞানিক দর্শন তার লেখাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

এই উপন্যাসটি **একা অন্য** ভিন্ন স্বাদের। বারবার নিজেকে ভাঙার মধ্যেই তার নতুনত্বের প্রকাশ। প্র্যাকটিসের বাইরে সেখানেই তার শান্তি। তার প্রতিটা উপন্যাস মৌলিক চিন্তাধারার ফসল। অনেক ক্ষেত্রে সাবেকিয়ানা ভেঙে বেরবার প্রয়াস। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্যকে নতুন করে খুঁজে চিনতে। তাকে লেখনীর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।

রবীন্দ্রসংগীত, ক্লাসিক্যাল সংগীতের অনুরাগী অনিরুদ্ধ বসুর শান্তির নীড় স্ত্রী স্মৃতি বসু।

লেখকের অন্যান্য বাংলা উপন্যাস



লেখকের অন্যান্য ইংরেজি উপন্যাস



প্রাক কথন

আমার নাম অভিশ্রী ঘোষ। ৫’৫’’, ৩৫, সিঙ্গল। একটা বিদেশি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করি। শ্যামলা হলেও এতদিনে বুঝে গেছি সুশ্রী। অন্য আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতো। ছিমছাম ছোট্ট সংসারে এখন আমি একা। প্রশ্ন উঠতেই পারে পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত আমি কেন এখনও অবিবাহিত। প্রশ্নটা শুধু অন্যদের নয়, আমারও।

এই পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজ এখানে। বুঝতে পারছি সময় হয়েছে এতদিনের পার হয়ে আসা জীবনের পর্যালোচনার। আত্মবিক্ষনের।

জীবীকার তাগিদে এতদিন সময় হয়ে ওঠেনি। এবার ব্রেক নিয়ে চেনা পরিবেশ থেকে দূরে কোথাও ছুটি কাটিয়ে আসতে হবে। ছুটিটা উপলক্ষ মাত্র। আসলে, নিরিবিলিতে নিজের জীবনটাকে দেখা। বিশ্লেষণ করা। এখান থেকে কোথায়?

এতদিন তো কেবল দৈনন্দিন জাগতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ছিলাম। ফুরসত কিংবা মানসিকতা ছিল না অন্তরটাকে মনের দাঁড়িপাল্লায় তুলে মাপার। যেহেতু এ মুহূর্তে কোনও পিছুটান নেই, এটাই অবকাশ। নিজেকে ঝালিয়ে দেখার। তার মধ্যেই হয়ত পেতে পারি আগামীর দিশা।

সম্পর্কের মায়াজাল থেকে বিচ্ছিন্ন না হলে নিরপেক্ষ বিচার হয় না। তাই এমন কোথাও বেড়াতে যাওয়া, চেনা পরিবেশ থেকে দূরে, যেখানে নিজেকে দেখার অফুরন্ত একাকী অবসর।

তাই পাওনা লেকের ধারে অ্যামাঞ্জি রিসর্ট। ভিলাতে আত্মবিক্ষন। ছিমছাম পরিবেশ। ছড়ান-ছেটান গুটি কয়েক ভিলা। বিশাল টেরেস। শুধু পাওনা লেক নয়, সহ্যাদ্রি পর্বতমালাও টেরেসে বসে দেখা যায়। চারবেলা সুস্বাদু খাওয়ারের বাহার।

নিজেকে দেখার অঢেল অবকাশ।

একাকী, অন্যভাবে।

সূচিপত্র

অবরোহণ

এক

স্বপ্নটা ভেসে বেড়াচ্ছে ওই দূর নীল আকাশে। যেখানে খাঁচাছাড়া পাখিরা বাধাবন্ধহীন উড়ে বেড়ায় মনের আনন্দে। প্রতিদিন নতুন নতুন ছন্দে। অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে। কোনও মেঘপরিদের দেশে।

যেখানে শুধুই নির্মল আনন্দ
নতুন ছন্দের প্রাণভরা স্পন্দনে।
জীবনের ঝংকার
নিত্য নতুন হর্ষ প্রতিটা কম্পনে।
কাছ থেকে দূরে, ব্যাপ্তির অনুভূতিতে
ক্ষুদ্র জীবনে প্রশস্তির বিকাশের ঘ্রাণে।

সেখানে কী ওরা কোনও নতুন সুর ভাঁজে কলকাকলির ছন্দে? ভালোবাসা, আবগের ঊর্ধ্বে নির্মল সম্পূর্ণতায়? ইচ্ছে হয় সূর্যের বর্ণালি আলোর প্লাবনে ডুবে যাওয়া চাঁদের পাহাড়টাকে সরিয়ে... স্মৃতির আর্কাইভকে দূরে ফেলে আরেকবার ওদের বাউন্ডুলে দুনিয়াকে পরখ করতে। বিহঙ্গের সাবলীল উড়ে যাওয়ার নিস্তরঙ্গ ছন্দ, বর্তমানের একাকী আসরে। মধুর নিবিড় স্পর্শে।

জীবন খোঁজে কবিতা!
জীবন খোঁজে সুর!
পটে আঁকা নতুন ছবি!
বাঁচার নতুন মন্ত্র!!
মগজের যন্ত্রটা তখন সাহারার মরুভূমির মতো বেসুরো রাগ।
শুনতে চায় না মন...
মোহময় থেকে নিরাময় পৃথিবীর অচেনা স্বাদ।

অ্যাম্যাঞ্জি বুটিক রিসর্টের ভিলার খাটে শুয়ে, পাওনা লেকের ওপারে সহ্যাদ্রি মাউন্টেনসের দিকে তাকিয়ে, আলো আর মেঘের খেলায় শূন্যতার মধ্যে স্বপ্নটাকে আবার ধরতে চাইছিলাম। পাহার ছাড়িয়ে তুলোর মতো ভেসে বেড়ানো মেঘেদের দেশে। পড়ন্ত দিনের ধূসরে অস্তগামী সূর্যের আলো চোখ ঝলসানো স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে পাওনার মুক্তোর মতো জলরাশিতে। দূরে শৃঙ্গগুলো আবছা পর্দায় আড়াল করেছে সাদা মেঘে, মেঘদূত হতে চায় শকুন্তলার দেশে। যেখানে পাখিদের কলতান হারিয়ে যায় নীড়ের আড়ালে। হারানো স্বপ্নগুলো আবার নতুন করে ফিরে পাওয়ার আশায়। অজানা, অচেনা, অদেখা হাতছানি দেয় আঁধারের মধ্যে জ্যোৎস্নার নতুন প্লাবনে। সেখানে সব চুপ। সেই মস্ত স্তব্ধতায় মন খোঁজে অচেনা নতুন কোনও রাগ। জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নব ঝংকার।

দিশাহীন ব্যর্থতায়, জীবনের লক্ষ্মণরেখার মধ্যে আমার মতো ক'জনই বা খুঁজতে চায় অন্য অস্তিত্ব? যেখানে নবরসের প্রেম, আনন্দ, ভয়, বিভীষিকা, ক্রোধ, বীরত্ব, বিস্ময়, করুণা, শান্তি আপেক্ষিক নয়।

ইহলোকের স্বপ্নমহল। গণ্ডিবদ্ধ বেষ্টনীর আরেক রূপ-ই তো জীবন বা বাঁচার নামে না-উপলব্ধি করা মরণ। আধো আলো, আধো কুয়াশা মেশা ধোঁয়াটে। অনিশ্চয়তার মধ্যেই হাতড়ে বেড়ানো ইহকাল,

পরকাল। সর্বকালের সংমিশ্রণে অন্তহীন মহাকালকে। জীবনের বৃত্ত ঘুরে সে-ই ফের শূন্যে স্থিত। অন্যে বলবে জীবন-মরণের চৌহদ্দির বাইরে পূর্ণতার খোঁজে কাজ কী!

সংখ্যার সেই শূন্যস্থানটাকে পূর্ণ করতে মরিয়া চেষ্টা বৃত্তের গোলকধাঁধার বাইরে। একাকী। অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে। তাই তো নিজেকে দেখা।

নতুন স্পন্দনের সন্ধানে।

শান্ত, কোলাহলহীন এই রিসর্টে।

নিভৃতে, একাকী।

টেরেসে বেতের গদিতে, কফি মাগ হাতে সামনে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে নজর নিবদ্ধ। পাশে মোবাইলটা হঠাৎ সচল। উত্তর না দিয়ে পড়ন্ত দিনের কুয়াশা মাখা আকাশের দিকে তাকিয়ে উদাস আমি। নানা কিসিমের দাবাগ্নি উতরে নিজেকে খুঁজতে আসা। শ্মশানবৈরাগ্যে, সমন্বিত সত্ত্বাকে নিজের আয়েনায় দেখার আশায়।

অস্পষ্ট। তবুও...

চেনা।

বোঝা।

উপলব্ধি করা।

এক শূন্য থেকে আরেক শূন্যে। বৃত্তের অন্য সংখ্যাগুলো জীবনের অর্থহীন অনুভূতির উপাখ্যান। নবরসের অনঙ্গকাহিনি পেরিয়ে রসহীন যাপনপ্রবাহ। জন্ম থেকে মৃত্যুর চক্রব্যূহে দ্বাররক্ষীরা তার ভাষ্য নানা বর্ণে সাজিয়েছে, সীমিত জীবনবোধের বাইরে।

পূর্ণ, নাকি শূন্যতা?

হদিশ দেয়নি কেউ। শুধু বলে দিয়েছে এটাই জীবন। মরণের পরটা অজানা, অসীমে লীন।

সেটা যে কী জানি না। বোধহয়, কেউ-ই নয়।

শূন্যতার নিশানায় আমার মধ্য-পঁয়ত্রিশ দোলাচলে। সেখানে কেউ নেই। অস্পষ্ট আয়নাটা। তা-ও মনের ইরেজার ধীরে ধীরে মুছে দিচ্ছে। নিজেকে একটু ভালো, স্পষ্ট করে দেখতে চাই। পরখ করতে চাইছি সেই অদেখা প্রতিবিম্ব। শ্যামলা চেহারার অন্য দিকে বিস্তৃত গভীর আমিটাকে, যা লোকজনের ভিড়ে অস্পষ্ট। তাকে পরখ করতে চাই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে।

জীবনকে।

বা শূন্যতার সীমাকে।

যে জীবন, রসের তরঙ্গে ওঠানামা করেছে বৈচিত্র্যময় অনর্থ সমেত, তাকে নিয়ে। আশাহীন বৈরাগ্যের নবীন মন্ত্রে। ইহলোক, পরলোকের ঊর্ধ্বে জাগ্রত মহালোকের খোঁজে। অন্ধের মতো হাত বুলিয়ে অনুভবে ছবিটা দেখা। মধ্যবয়সের চেতনায় বা সন্ধ্যালোকে।

সব চরিত্রই সেখানে আপেক্ষিক।

সত্য শুধু আমি।

ফোনটা আরেকবার বেজেই চুপ। মৌনিসের একটা টেক্সট *'কল মি হোয়েন ফ্রি'*। কফি শেষ। আরেকটা হলে মন্দ হয় না। ফের ঘরের কফি মেকারে। চুমুক দিয়ে ব্যলকনিতে। সামনে খোলা আকাশ...

দুই

পরিচয়টা তো আগেই দিয়েছি। একা নিজেকে দেখতে তাই কাজের ফাঁকে কিছুদিন ছুটি নিয়ে পালিয়ে আসা এই অ্যাম্যাঞ্জি বুটিক রিসর্টে। কটেজের শান্ত পরিবেশে অবসরে নিজের সঙ্গে কথা বলা।

নিঃশব্দে, একাকী, একা অন্য। কটেজের ব্যালকনিতে বসে হারিয়েছি মৌনতার মিছিলে... আকাশের সঙ্গে মিশে যাওয়া লেকের নীলে...

উড়তে থাকা সাদা মেঘগুলো কী কিছু বলতে চাইছে?

সূর্যের বর্ণালি প্লাবনে তলিয়ে যাওয়া চাঁদের পাহাড়টাকে সরিয়ে... স্মৃতির আর্কাইভে ডুবে অতীতকে স্পর্শ করতে। যখন অনুভূতি উত্তাল ছুটে চলে, তখন তো সময় থাকে না বিবেককে পরখ করে দেখার... বিহঙ্গের সাবলীল উড়ানের নিস্তরঙ্গ ছন্দে ফেলে আসা স্মৃতির জলসায় ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে না ।

জীবন তখন...

এক কবিতা!

এক সুর!

পটে আঁকা ছবি!

বাঁচার নতুন মন্ত্র!!

মগজে যন্ত্রটা তখন মরুভূমির সুরহীন রাগ।

মন শুনতে চায় না...

ঈশ্বরের বরমাল্য নিয়ে আমার জন্ম। রক্তে নাচ। তখনও ভালো করে কথা ফোটেনি। মা বলত, তখনই গানের তালে তাল মিলিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচ। তার মধ্যেই, মাকে খাওয়াতে হত। ক্লান্ত হয়ে পড়লে, ঘুম। স্বপ্ন দেখার বয়স ছিল না। তাই শান্তি। তখনও স্বপ্নের অতৃপ্তি গ্রাস করেনি জীবনের প্রবাহ। চপল আনন্দে মনের ছন্দকে পায়ে এঁকে স্ফূর্তি।

আরেকটু বড় হতে পাড়ার ফাংশনে সুযোগ। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে পার্শ্বচরিত্র থেকে শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা। মেয়ের যখন নাচে এত শখ, মা-ই ভর্তি করে দিয়েছিল কলামণ্ডলমে। মরুতাপ্পা পিল্লাই ঘরানায় থঙ্কমণি কুট্টির কাছে তালিম।

তালিম শেষে বাড়িতে স্নান সেরে ছাদে ফুরফুরে হাওয়ায় তারা গোনা। তখনও তারা হওয়ার ইচ্ছেটা মাথাচারা দেয়নি। সপ্তর্ষির মধ্যে, পাঠ্য বইয়ে সদ্য পড়া ‘দ্য গ্রেট বেয়ার’ খুঁজতেই ব্যস্ত। বিশাল ক্যানভাসে সাতাশটা নক্ষত্রের কয়েকটাকে চিনতে চাইছি। রূপকথার পরিদের সঙ্গে পাড়ি দিতে হবে স্বপ্নের ময়ূরমহলে। তাদের অন্য ভাষা শুনতে। অন্ধকারের মাঝে গুম মেরে বসে কোনও প্রতীক্ষায়।

তারাদের?

যারা, প্রস্ফুটিত আমার আমিটাকে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠবে।

অন্ধকারেও আলোকছটা খুঁজতে। মনমাঝির বৈঠা হাতে, সপ্তর্ষির পিঠে চড়ে, আকাশগাং পাড়ি দিতে কোনও এক অচেনা রূপনগরের দেশে মোহময় অজানার হাতছানি। পার্থিব চাওয়ার অলৌকিক নিঃশব্দ আহ্বান। তারাদের সিঁড়ি বেয়ে কে যেন ফিসফিস করে ডাকত‘আয়...আয়...’

নাম না-জানা তারাগুলো স্বপ্নের দরজা খুলে, আলোর সিঁড়ি বিছিয়ে, মনের ক্যানভাসে স্বপ্ন পরিদের নাচের ভেল্কি আঁকা। আনন্দে উৎফুল্ল কিছু অচেনা পরির দল। ছড়িয়ে দিচ্ছে মোহময় দ্যুতি। তাদের আলোয় প্রদীপের সিঁড়ি বেয়ে, আকাশগাঙের ছায়াপথ ধরে ওই ক্ষীণ দৃপ্ত আলোর দিকে একাই

হেঁটেছি। এগিয়ে আসতে দেখে মহানন্দে হাততালি দিয়ে, হই হই করে উঠে, দ্বিগুণ জোরে মিটমিট করে জ্বলে উঠেছিল তারাগুলো। জ্বালিয়ে দিয়েছিল জোনাকির ফুলঝুরি - আকাশগাঙে পালতোলা আনন্দের মধুকর ডিঙায় বসেই।

লক্ষ করিনি হঠাৎ পেছন থেকে দিহান আমায় জড়িয়ে ধরেছে। কানের পাশে তার দ্রুত শ্বাস। ওর দেহের ওমে অন্য অনুভব, যা আগে হয়নি। জানতে চেয়েছিল, এখানে কী করছি। লজ্জায় আমার কালচে মুখটা বেগুনি। উত্তর না দিয়ে সামনে ঘুরে দাঁড়ালাম। দুহাতে মুখটা তুলে ঠোঁটটা ডুবিয়ে দিয়েছিল আমার ঠোঁটে। ঠিক সেই মুহূর্তে, সারা দেহে অজানা বিদ্যুতের ঝিলিক। শিহরণটা ধীরে ধীরে শিরদাঁড়া দিয়ে নামতে থাকল জন্মস্থলের কেন্দ্রবিন্দুতে।

পাশের বাড়ির দিহানকে বরাবরই ভাল লাগত। হৃদ্যতা মাসিক শুরু হওয়ার অনেক আগে। যখন বাবা বাড়ি করে লেক গার্ডেনসে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করল। ঘনিষ্ঠতা আরও ঘনীভূত সাউথ পয়েন্টে পড়ার সময়। একই ক্লাস। স্কুলের ফাঁকে খুনসুটি। নোটস বিনিময়। আমাদের বাড়িতে দিহানের অবাধ বিচরণ। রবিবারে মা লুচি বানাবার সময় ঠিক হাজির। অফার করতেই বিগলিত হয়ে দিহান মাথা নাড়ত। পেটুক কোথাকার। দেখে দেখে ঠিক খাবার সময় হাজির। আমার চেয়ে খাওয়ায় মনোযোগই বেশি। তবুও উপস্থিতিটা অন্য রং ছড়াত। রংটা যে কি ও নিজেই জানত না।

আমি জানতাম ওটা প্রেমের রং। নবরসের অনভুতির একটা সুর। একটা তান। আমার সেই জীবনে নতুন ছন্দের ঐকতান। সেই ছন্দের তালে ভালো লাগত দিহানকে।

সত্যি, ভালোলাগার কী কোনও রং আছে?

ভালোবাসা! সে তো বেঁচে থাকার ছন্দ। সেই ছন্দের বোলে দিহান নেই, যে আমার তালে নাচবে।

তবুও পেটুক ছেলেটা আজ এসেছে অন্য খিদে নিয়ে। স্বপ্নের রাজপুত্তুরের প্রতি মনের খিদে জন্মাবার অবকাশ তখনও হয়নি। দিহান যে কখনও জায়গা করে নিতে চেয়েছে, এমনও নয়। উঠতি বয়স। আমার তখন ভরা গাঙের প্লাবন। সে জোয়ারে যে ও ভাসবে না, ভাবাটাই ভুল। প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার করার ক্ষমতা তো আমাদের নেই।

চুম্বন, সম্ভোগ, শিহরণে, দুটিতে তোলপাড়। প্রেমের ছন্দের নতুন স্ফুরণ।

উঠতি বয়সের স্বেদাক্ত আবেগে ভাসা, শৃঙ্গার।

কতক্ষণ মুখ স্বাদ নিয়েছিল, মনে নেই। শৃঙ্গারের উষ্ণতায় রোমাঞ্চিত তপ্ত আবেগ তখন পরিত্রাণ খুঁজছে দেহের প্রতিটা অণু-পরমাণুর মধ্যে।

ছাদের মখমল হাওয়া, জ্যোৎস্নামাখা সন্ধে সাক্ষী। চাওয়ার রংটাকে মনের ক্যানভাসে তুলি দিয়ে আঁকার সময় তখনও হয়নি। তবে দূরের ওই তারাদের কাছে পাওয়ার স্বপ্নটা জেগেছিল। কিংবা ধূসর আকাশের বিস্তীর্ণ আবরণে, তারার আভরণে সাজতে। দূর আকাশে নয়, জাগতিক তারামণ্ডলে আরেকটা নক্ষত্র হতে। ওকে সরিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম।

দিহান মিটিমিটি হাসছিল। হয়ত আরও বেশি কিছু চাওয়া নিয়ে। যা এখানে অসম্ভব। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে ছুটেছিলাম নিজের ঘরে, বাথরুমে।

সাউথ পয়েন্ট থেকে প্রেসিডেন্সি। দিহান থেকে সৌরিক। লেক গার্ডেনসে থাকলেও বিচরণ অন্য দুনিয়ায়। দিহান ডাক্তারি পড়তে চলে গেল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে। পার্ক সার্কাস থেকে কলেজ স্ট্রিটের দূরত্ব ব্যবধান আনল মনে। প্রথম দৈহিক আবেগের রোমহর্ষক স্মৃতি ফেলে ডুব দিলাম গভীরে। স্বপ্নের রাজপুত্তুরের সন্ধানে নয়। বাস্তব স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে।

সৌরিক একই কলেজে স্ট্যাটিস্টিক্সের মেধাবী, কৃতী ছাত্র। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কান্ডারি।

একদিন বন্ধুরা মিলে ভিক্টোরিয়ায় ফুচকা খাচ্ছিলাম। শালপাতাটা ফেলার আগে আমিই একটা ফাউ চেয়েছিলাম। ফুচকাওয়ালা হাই হাই করে উঠল। এই মেহাঙ্গার বাজারে ফাউ! অসম্ভব। যুক্তি দিয়েছিলাম, সবখানেই তো বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি। ফুচকাওয়ালা প্রতিবাদ করেছিল, কোই ফোকট মে কুছ নেহি দেতা। দিখাতা হ্যায় ফোকট মে। রুপয়ে দুসরে জগহ সে কামা লেতা।

হঠাৎ পাশ থেকে এক পুরুষ কণ্ঠের অনুরধ, দে দো না। হামারে তরফ সে।

ফিরে তাকালাম। পাশেই চার পাঁচটা ছেলের জটলা। কয়েকজনের মুখ চেনা। কোথায় দেখেছি মনে করার চেষ্টা করলাম। ওদের মধ্যে ছ'ফিট লম্বা সৌরিক এগিয়ে বলল, ইচ্ছে যখন হয়েছে পেট পুরে খেয়ে নিন। ফাউ। ফাউ কী করে হল? টাকাটা কী ও দেবে? ও হেসে বলল, কোথা থেকে খরচা এল, ভেবে কী লাভ? ফাউ পাচ্ছেন, সাঁটিয়ে যান।

লাইন মারার জন্য ফোকটে খাওয়াচ্ছে। বাছা, তোমার ফাঁদে পা দিচ্ছি না। আমি অ্যাভয়েড করার জন্য বললাম, পেট ভরে গেছে। যদি ফাউ পাওয়া যেত, চিবোতে চিবোতে যেতাম। কথা না বাড়িয়ে হাঁটা দিলাম। ও ছাড়ুর পাত্র নয়। আমাদের পেছনে পেছনে এসে বলল, কোথায় দেখেছি বলুন তো...

সরাসরি বলে ফেললাম, আপনার বেডরুমে।

ওকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সদলবলে হাঁটা দিলাম।

থতমত সৌরিক আমাদের যাওয়ার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে। স্তম্ভিত। এরকম সোজাসাপ্টা জবাব কল্পনারও বাইরে। বেশ বুঝতে পারছি আমার ঢেউ খেলানো নিতম্বের চুম্বক আকর্ষণ ওর চাহনির কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের মেয়েদের একটা থার্ড আই আছে। পেছনে কি হচ্ছে দেখতে না পারলেও, বুঝতে পারি। মাপছে। নিতম্ব না আমাকে, কে জানে? মনে মনে নিশ্চয়ই ফুঁসছে। ফুচকা তো খেলামই না, উল্টে ওর বুদ্ধিদীপ্ত মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছি। ফুচকাওয়ালা ঠিকই বলেছে, জীবনে ফাউ বলে কিছু হয় না। তা সত্ত্বেও আমার আবদারকেই হয়ত সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে। আমি চাবুক, না জীবন্ত বোমা, বিশ্লেষণ করতে দিয়ে ওখান থেকে প্রস্থান। বাড়িতে গিয়ে ভাবুক নিভৃতে, একা।

ভুল তো কিছু বলেনি। একই কলেজে, তাই আগে নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। দল বেঁধে কলেজ ক্যান্টিনে আড্ডা মারছি। আড়চোখে দেখছিলাম পাশের টেবলে বসে ঝারি মারছিল। ছোটবেলা থেকেই নমনীয়, শ্যামলা, ব্যালেন্সড দেহের ওপর অগণিত ছেলের দৃষ্টিবাণে আমি সিজনড। কেউ হয়তো সুন্দরী বলবে না। তবু আয়নায় যখন দেখি, বুঝতে পারি লালিত্য রয়েছে। এতে যে সৌরিক আকৃষ্ট হবে, তাতে আশ্চর্য কী।

পরের দিন রবিবার।

ঘরের দরজা বন্ধ, স্নান সেরে বিবস্ত্র নিজেকে আয়নায় দেখেছি। রংটা নয় একটু কালো। তাতে কী? দেহের গঠনে তরঙ্গ, চুম্বকের মতো আকর্ষণ করার পক্ষে কাফি। সুন্দরী কোনও কালেই ছিলাম না। তবে শ্যামলা তন্বী দেহে নারীত্ব সব অংশেই বর্তমান। সৌরিকের আকৃষ্ট না হওয়ার কোনও কারণ নেই।

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে সদ্য কলেজে। আবরণ কিংবা নিরাবরণ। ঢেউ খেলানো ৩৬-২৮-৩৮, ৫'৫'' ফিগারটা চোখে না পড়ে যায় না। তার ওপর লরেটো, প্রেসিডেন্সির ছাপ। অ্যাক্সেন্টে ইংরেজি মেশানো

বাংলা। মধ্যবিত্ত বাড়ির হলেও এলিটের দলে ফেলে দিয়েছিল। চলার ছন্দেও অন্য মাদকতা। ইভেন অ্যাট দ্যাট এজ, আই নিউ টু ক্যারি মাইসেলফ।

রূপে না হলেও যৌবনে।

ঘন কালো চুল কাঁধ অবধি ছড়ানো। আঁটসাঁট নিতম্ব, বুকে তেমন মেদ জমেনি। পুষ্ট শরীরে শ্যামলা রংটা আরও ঠিকরে বেরোচ্ছে। ঘন কাজলকালো চোখ। নিখুঁত দাঁতের সেটিং। মন ভোলানো হাসিতে গালে টোল। কৃষ্ণকলির মতো গ্রামীণ সারল্য, নাকি বনলতা সেনের স্নিগ্ধতা, কবিরাই বলতে পারত। কোনও কবি তো আমাকে নিয়ে কবিতা লেখেনি। শুধু জানতাম, চাহনির তীব্রতা পুরুষের হৃদয় বিদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট। নতমস্তকে সঁপে দিতে দ্বিধাহীন, সেই গহন দৃষ্টির রশ্মিতে।

নাঃ, মডেলিং-এর কোনও অফার আসেনি। ঘুরেফিরে নিরাবরণ দেহটা আয়নায় বারবার করে দেখছিলাম।

আত্মতুষ্টি?

না, সৌরিকের কাছে কতখানি আকর্ষণীয়, মাপতে?

বাঁ হাত দিয়ে আলতো করে চুলের কিছু অংশ সরিয়ে বুকে, শরীরে হাত বুলিয়ে অনুভব করতে চেয়েছিলাম যৌবনে কোথাও ভাটা পড়েনি তো। ঠিক যেমন কুড়ি বছরের মেয়ের হওয়া উচিত। স্তন ক্রমশ সরু কোমরে মিশে বুকের উচ্চতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। নাভির কেন্দ্রবিন্দুতেও কী চুম্বকের আকর্ষণ? দৃষ্টি নীচে নেমে ঢেউ খেলানো পুরুষ্টু নিতম্বে। পেছেন ফিরে, ঘাড় ঘুরিয়ে আয়নায় দেখলাম। দুই নিতম্বের সঙ্গমে খাঁজটা আরও স্পষ্ট, ঠিক যেন দুই পর্বতমালা মিশেছে করিন্থ ক্যানালের সংযোগে। পেছনে চোখ না থাকলেও, অন্যান্য মেয়েদের মতো লোকের শ্যেন দৃষ্টি চলার সময় বুঝিয়ে দেয় কোথায় বিচরণ। নিটোল বাঁধানো শরীর। তাকে আয়নায় আরও কাছ থেকে নিখুঁত করে দেখার মধ্যে শুধু আত্মতুষ্টি নয়, দৈহিক কদরটাও উপভোগ্য। বিবস্ত্র অবস্থায় পুরো আয়নার সামনে না দাঁড়ালে এমন নিখুঁতভাবে দেহের প্রতিটা আনাচ কানাচ বিশ্লেষণ করা যায় না।

পুরুষেরাও তো তাদের লেজার দৃষ্টি দিয়ে তাই করার চেষ্টা করে। সৌরিকই বা বাদ কেন?

সেই আড়চোখের দৃষ্টি কোনদিন অজান্তে ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তরিত হবে, বুঝতেই পারিনি। আলাপ, ঘনিষ্ঠতা, প্রেম। নন্দন থেকে ফ্লোটেল।

তখনও পূর্ণিমার চাঁদ ওঠেনি। তখনও রাগ ইমনের শেষ মূর্ছনা স্তব্ধ হয়ে যায়নি। তখনও ফ্লোটেলের অ্যাম্বিয়েন্সে সেই রাগেরই ঝালা। আমরা দুজনে শুনছিলাম। নিঃশব্দে, কিছুটা নীরবে। ভাষাহীন, অনুভূতির মিছিলে। দিনান্তের শেষ রশ্মির মায়াময় আলোকে...

গঙ্গাবক্ষে ফ্লোটেলের ব্রিজেস রেস্টুরেন্টের ডেকে মোমবাতির আলো-আঁধারিতে ওয়াইনে চুমুক দিতে দিতে। তাকিয়েছিলাম মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা একফালি চাঁদের দিকে। লক্ষ করলাম মেঘটা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। কালো আকাশে দু-একটা তারা ফুটে উঠছে। সেই তো তারার স্বপ্ন থেকে তারা গোনার বয়স। প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে জলের কলধ্বনি মন্দ লাগছিল না। গঙ্গার বিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতার দিকে দুজনেই তাকিয়ে। দূরে ওপারে রামকেষ্টপুর ঘাটের আলোগুলো জ্বলজ্বল করছে। অন্ধকারে ঢেউয়ের ওঠাপড়া। বাঁ দিকের সাজানো স্টেট ব্যাঙ্কের আলোর রোশনাই।

এখন আর কোলাহল নয়। নিভৃতে শান্তির পথ খোঁজা। যার পাশে চুপচাপ অনুভবে জীবন কাটানোর আরেক স্বপ্ন। রূপকথা থেকে বাস্তবে।

জলরাশির দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, বেডরুমে দেখা হবে কি না, জানি না। এই অ্যাটমস্ফিয়ার, অ্যাম্বিয়েন্স বেডরুমের থেকে অনেক বেশি রোম্যান্টিক। উত্তরে ও মুচকি হেসে বলেছিল, কে বলতে পারে কার সঙ্গে কোথায়, কীভাবে, কখন দেখা হয়ে যায়। এভরিথিং ইজ ডেস্টিনি। অনেকটা ফাউ ফুচকার মতো।

নিয়তি কি সন্ধ্যারাগের নতুন সুর আঁকে। সন্ধ্যারাগ কেন? জীবনের সব রাগ তো নিয়তির সুরে-ছন্দে-স্পর্শে-চেতনায় বাঁধা। সেই না-জানা সুরটাকে কেবল-ই মেলাতে চেয়েছিলাম চেনা চিরপরিচিত জীবনের ঝংকারে। হিসেবের খাতা খুলে। ব্যবসায়িক অঙ্কের কালিমায়... কিংবা স্বপ্নের ঘোরে মোহের আঙিনায়...

যা চাওয়া যায়, তা কি পাওয়া যায়?

এখন, এই অ্যাম্যাঞ্জির স্থির জলরাশির দিকে তাকিয়ে সেই কথাই বারবার ফিরেফিরে আসছে। তখন বয়স ছিল না, পাওয়ার আসল অর্থ বোঝার। জৈবিক চাহিদাগুলো তাড়া করে বেরিয়েছে। এখন কী তবে পশ্চিমের বদ্ধ জানলাটাকে ভেঙে সকালের সূর্য ওঠা পুবটাকে দেখা?

আজ যখন পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ মিলেমিশে একাকার, বুঝতে পারছি চাওয়া-পাওয়ার অঙ্কটা কোনও বিশিষ্ট দিকে পুঞ্জিভূত নয়। দিকশূন্য নাবিক অ-দেখা গন্তব্যের সন্ধানে।

একাকী, নিভৃতে।

অ্যাম্যাঞ্জিতে...

এই হিসেবের অঙ্ক কষতে কষতেই ধূলিসাৎ জীবন। বুঝিনি তাকে বাস্তবে টেনে কেনই মিশিয়ে দেওয়া মুহূর্তটুকুকে? পাওয়াটা তো বোনাস। সেই মুহূর্তে কী পেলাম... সেটাই কী বড় নয়? হারানোর জন্য তো গোটা জীবন পড়েই আছে।

জলতরঙ্গের ঝিলমিলে তাকিয়ে মনে হয়েছিল সেরকম ভাবে আগে তো কোনওদিন ভাবিনি। স্বাদ না পেলে, পাওয়ার অর্থটাই বা বুঝব কী করে? বুঝিনি, জাগতিক চিন্তা ভুলে মুহূর্তের ভালোলাগাটাই সব। কালকে কী হবে, কেউ কি জানে?

মন চেয়েছিল বলেই তো সৌরিকের সঙ্গে ফ্লোটেলে। নইলে কেউ তো দিব্যি দেয়নি তার সঙ্গে ওখানে যাওয়ার জন্য। ভালো লেগেছে বলেই তো। মুহূর্তটাকে গৌণ করে অপ্রাসঙ্গিক চিন্তায় তা যে মাটি হয়ে যায়। সেটা বোঝার বয়স ছিল না তখন। আধো আঁধারিতে স্থির পলকে ও তাকিয়েছিল আমার আবছায়া জলের দিকে ফেরানো সিল্যুটটার দিকে। হয়ত নতুন কোনও অব্যক্ত রাগ শুনতে।

মুহূর্তের মাধুর্যটা এতদিনে স্পষ্ট।

সেই বয়সে কত রঙিন স্বপ্ন। না শোনা কোনও অগ্রন্থিত সুর। আজ বুঝি, এসব ছোট ছোট মুহূর্তের মধ্যে সুরের ঝংকারেই তো গাঁথা হয় জীবনের ছন্দময় কলতান। তারই মধ্যে বাঁচে প্রাণ। যার উদ্ভাসে দৈনন্দিন জীবনের নব নব ঐকতান। নবরসের নব ছন্দে।

চেয়ার ছেড়ে ফ্লোটেলের ডেকের রেলিং ঘেঁষে আকাশের দিকে চেয়ে। সরে যাওয়া মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদটা আরও দৃপ্ত। হয়ত সেখানে কোনও পাগল মুনলিট সোনাটা বাজাচ্ছিল না, হয়ত কোনও মাঝি গলা ফাটিয়ে গান গাইছিল না। ফ্লোটেলের ডেকের ওপর সুসজ্জিত স্টেট ব্যাঙ্কের আলোটা সব কিছুকে ম্লান করে দিয়েছিল। তবু সেই বিশাল অন্ধকারে প্রবীণ চাঁদ মেঘের ফাঁক গলে বেরিয়ে হাসছিল। ভরিয়ে দিয়েছিল আমার দাঁড়িয়ে থাকা সিল্যুট।

সেদিন যদি বুঝতামঃ

গিভ টু মি দ্য লাইফ আই লাভ,
লেট দ্য লেভ গো বাই মি
গিভ দ্য জলি হেভেন অ্যাবাভ
অ্যান্ড দ্য বাইওয়ে নাই মি

আজ আবার অ্যাম্যাঞ্জির টেরেসে। সেই পরিবেশ। তফাত শুধু, সেদিন সৌরিক ছিল। আজ আমি একা।

এবং অন্য।

জীবনের অনেক চরাই-উতরাই পেরিয়ে আজ বুঝতে পারছি সেদিনের অনভূতির সঙ্গে পার্থক্য। এর জন্যেই তো সামাজিক বন্ধন ছেড়ে অ্যাম্যাঞ্জিতে। মুক্ত বিহঙ্গের স্বপ্নে। মুক্তি তো মনের বিকাশে। ওই পাখিদের মতো, ডানা মেলে উদার দিগন্তে হারানোয়। নিঃসঙ্গতার বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে, ওদের মতো ভেসে বেড়ানোয় অনাবিল মুক্ত নির্মল আনন্দ। উন্মুক্ত, বাধা-বন্ধনহীন। জীবনের অন্য ছন্দ। যার স্বাদ আগে কখনও অনুভব করার চেষ্টা করিনি। সাংসারিক আবদ্ধে চরকির মতো শুধুই দিশাহীন ঘোরা।

কীসের আশায়, কে জানে?

পেলেই বা হরিপুরি কী হবে, না পেলেই বা কী হারাব?

আগে যদি জানতাম।

ফুরফুরে হাওয়ায় আরেক অনুভূতি। ভালোলাগার, তৃপ্তির, মুহূর্তকে বরণ করে নতুনকে খোঁজার। যা আগে করিনি। ভালোলাগাকে নিজের মতো করে উপভোগ করা। চলার পথে এমন অনেকে আসে যার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, হবেও না। মোহহীন শান্তির নতুন ছন্দে একঘেয়েমি থেকে ক্ষণিকের মুক্তি। ঠিক যেমন, সুযোগ এসেছিল দিহান বা সৌরিকের সঙ্গে।

মুহূর্তের পাওয়াটাই বা কম কীসের?

প্রশান্তিময় ভালোলাগাও তো ভালোবাসার রূপ।

চাঁদের আলোয় সাহ্যাদ্রির চেহারা অদ্ভুত মায়াময়। আমাকে নিয়ে গেছে জগতের বাইরে। পাওনা লেকের জলে পড়ে চিকচিক করছে। ঝলমলিয়ে উঠছে চাঁদের আলোয়। আশ্চর্য রঙের খেলা। জীবন্ত। উঠছে, পড়ছে, নাচছে। চাঁদের কুচি গায়ে মেখে জলের শান্ত তরঙ্গ আলোর প্রতিবিম্বে যেন মুক্তোর কণা। কাড়াকাড়ি করছে চাঁদের টুকরোগুলো নিয়ে।

চারধারে অন্ধকার। বাইরে ধীরে ধীরে রাত নামছে। দূরের ঝোপঝাড়গুলো অন্ধকারের চাদর মুড়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে, যেন এক্ষুণি চাদর ফেলে হইহই করে লাফিয়ে উঠবে। শুধু তারই অপেক্ষা। আকাশটাও কেমন গুম মেরেছে। যেন সে-ও কোনও ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে। তারাগুলোও অন্য দিনের মতো মিটমিট করছে না। নিস্পলক দৃষ্টিতে তারাও কোনও কিছুর অপেক্ষায়।

অবাক হয়ে গেলাম। আকাশের, বিশেষত রাতের আকাশের নানা রূপ দেখেছি। কিন্তু আজকের আকাশটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমি অবাক, তাকিয়ে। হঠাৎ চোখ পড়ল পুব আকাশে। কখন পূর্ব দিকটা আলোয় আলোময় হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি। আকাশটা যেন হঠাৎই হয়ে উঠেছে স্বর্গলোকের উৎসব বাড়ির প্রবেশদ্বার। আলোয় সাজানো সেই দরজার ভিতরেই যেন ঝলমল করছে আনন্দময় মহোৎসব। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে। চোখের সামনে ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে এক পর্দা। সেই মহাজাগতিক পর্দার পিছন থেকে আবির্ভূত হল এক বিশাল মোহময় চাঁদ।

সঙ্গে সঙ্গে যেন শুরু হয়ে গেল আনন্দের মহাপ্লাবন। এতক্ষণ স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে থাকা তারাগুলো হঠাৎ মহানন্দে হইহই করে দ্বিগুণ জোরে জ্বলতে শুরু করল। এতক্ষণ চুপচাপ অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থাকা ঝোপঝাড়গুলো হঠাৎই একসঙ্গে তাদের সারা গায়ে জোনাকির ফুলঝুরি জ্বালিয়ে দিল। হাসতে হাসতে মাথার উপর এসে দাঁড়াল এক অপার্থিব আনন্দময় চাঁদ। নবরসের আনন্দ মূর্ছনা তার দ্যুতিতে।

সেই আনন্দের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে মনটা অদ্ভুত প্রসন্নতায় ভরে গেল। আকাশ, মাটি, গাছপালাকে সাক্ষী করে গেয়ে উঠলামঃ

'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে

উছলে পড়ে আলো...'

চরাচরের আনন্দ সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে আমি ক্ষতবিক্ষত নশ্বর দেহ নিয়েই আনন্দ হয়ে গেলাম।

তিন

অ্যাম্যাঞ্জি রিসর্টে পরের দিন।

আজ আকাশটা অদ্ভুত রকমের মায়াময় নরম আলোয় ভরে গেছে। আধফোটা কৃষ্ণচূড়ার মতো নরম। ছোট্ট দোয়েলছানার বুকের মতো গরম। উড়ে যাওয়া বালিহাঁসের মতো দূরে কোথাও হারিয়ে যাওয়া মন-কেমন-করা আলো।

আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা তারাগুলো আজ আনন্দে হাসছে। কাছে-দূরে যে-যেখানেই থাক, আজ সবকটা তারাই যেন এক অদৃশ্য বন্ধনে হাত ধরাধরি করে চাঁদটার চারদিকে নেচে নেচে ঘুরছে। বিশাল পূর্ণিমার চাঁদ যেন যমুনাপুলিনের তীরে বাঁশী হাতে দাঁড়িয়ে থাকা কানাই। হাজার হাজার তারাগুলো যেন হয়ে উঠেছে ব্রজের সুন্দরী গোপবালার দল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মনে হল, শুনতে পাচ্ছি এক আশ্চর্য সুরের নুপূরনিক্কন। এক আশ্চর্য মহাজাগতিক সংগীতঃ

'আজু কি আনন্দ, আজু কি আনন্দ

ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ...'

সারা শরীরের রোম শিহরিত হয়ে উঠল। সমগ্র সত্ত্বা দিয়ে অনুভব করতে পারছি বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা মহান অমানুষী প্রেমকে। সৌরিকের থেকে অনেক বেশি নিবিড়। অনেক বেশি গভীর। ফ্লোটেলের মধুময় সন্ধ্যার থেকে বহু গুণ মর্মস্পর্শী। সেই সন্ধ্যার রেশ তখন মুহূর্ত ছাড়িয়ে গভীরে...

আমরা দুজনে যৌবনের নতুন স্রোতে ভাসছি। তখনও পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে ওঠেনি। তখনও পূরবীর শেষ মূর্ছনাটা স্তব্ধ হয়ে যায়নি।

প্রতীক্ষায়...

পুরিয়া ধানেশ্রীর নতুন আলাপের আশায়। সেইসঙ্গে, আমাদের আলাপটাও... গভীর থেকে গভীরতর। সৌরিক কোহিনুরের নীল কাজ করা সাদা পাঞ্জাবি পরেছিল। আমি কচি কলাপাতা রঙের সবুজ শাড়ি। দুজনেই কিছু শুনতে আগ্রহী। হৃদয়ের স্পন্দন? মনের নিবিড় মেলবন্ধন। নিঃশব্দে, কিছুটা নীরবে। ভাষাহীন, অনুভূতির মৌনমিছিলে। দিনান্তের শেষ রশ্মির মায়াময় আলোকে...

সেটাই স্বপ্ন।

মুহূর্তের জন্য হলেও, স্বপ্ন বাস্তবের পৃথিবীতে যদি চাঁদের মতো নেমে আসে, ক্ষতি কী? সেই মুহূর্তে স্বপ্ন থাকে না, বাস্তবও না। থেকে যায় শুধু মুহূর্তটুকু। মুহূর্তের মাধুর্যকে অনুভব করার বোধ জেগেছে। যার মর্ম সৌরিকের কাছ থেকেই শেখা ফ্লোটেলের ডেকে। ভাবনাগুলোকে চাঁদের পাহাড়ে ভাসিয়ে দিতে। জীবনের ছন্দটাকে একটু-বা ঝালিয়ে নিতে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই। হয়তো সামনে-পেছনে সব সময় শূন্যতাই থাকে। বৃথাই তার মানে খোঁজার চেষ্টা, অর্থহীন স্বভাবে।

লক্ষ করলাম, একফালি চাঁদ সুদূর আকাশের কোণে উঁকি মারতে শুরু করেছে। কখন যেন জ্যোৎস্নায় ভরিয়ে দিয়েছে। সেই আলো-আঁধারিতে সৌরিক কিন্তু পুরিয়া-ধানেশ্রীর বদলে আমার দেহের রাগই শুনতে উদগ্রীব। আমার লম্বাটে শ্যামলা মুখটাকে আরেকবার দেখা। আমার কাজলকালো গভীর চোখের দিকে চেয়ে অনুভূতিকে টের পাওয়ার আশা। আমার কাছে অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করা তখন গৌণ। মুখ্য শুধু মুহূর্তটা সৌরিকের সঙ্গে।

হারিয়ে যাওয়া হাজার লোকের ভিড়ে সেই তো আমার স্বপ্নের রাজপুত্তুরের পাশে বসে প্রাণ স্পন্দন। ঢাকুরিয়া লেকের জলতরঙ্গের মতো মনে শিহরণ জাগাচ্ছিল এক নতুন অনুভূতি। এই কী ভালোবাসা? আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের প্রত্যাশা? নাকি দূরের ওই চাঁদটার এক ঝলক স্পর্শের মতো হারিয়ে যাওয়া মায়ার খেলা? ইহলোকে দ্যুলোকের কোনও না-দেখা অচেনা ছায়া?

আজ বুঝি সব-ই হারিয়ে যায়। দিন-ক্ষণ-রাত্রি। স্রোতস্বিনীর তীরে আমরা শুধু নীরব বয়ে যাওয়া অসহায় যাত্রী। ভবিষ্যৎ ভুলে মুহূর্তটাকে বরণ করার মধ্যেই পরিতৃপ্তি।

জলের শব্দ ছাড়া চারদিক নিস্তব্ধ। দূরে ঝিঁঝি পোকার ক্যাকফনিক অর্কেস্ট্রা। জলের মৃদুমন্দ তরঙ্গেই যেন পুরিয়া-ধানেশ্রী। ভেতরে ভেতরে গোলাপের নতুন কুঁড়ি। প্রস্ফুটিত হতে চায় জাগরণের নতুন ছন্দে। বুঝিনি গোলাপ কাঁটা নিয়েই জন্মায়। আলো-আঁধারিতে সৌরিকের মুখটা ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না। শুধু একটা সিল্যুট। আমার মনের লেন্সে কায়া আর মায়ার যুগলবন্দি চলছে।

কাকে ধরব?

এখন শুধু ভেসে যাওয়া অনুভূতির মায়ায়।

মন চাইছে অন্য কিছু।

না... না... মায়া নয়, কায়া।

সৌরিককে ছোঁয়া, আরও কাছে পাওয়া, সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে নিজের করে নেওয়া।

সব কিছু থেকে যাক নির্বাক।

মায়া?

নাকি, আধো আবছায়ায় ছুটে চলা মুহূর্তের টুকরো মাত্র? সেই প্লাবিত আঁধার ভেদ করে গেয়ে উঠেছিলামঃ

'নেই সেই পূর্ণিমা রাত
কিছু সুর কিছুটা আবেগ
এ কি শুরু না শেষ?
বোঝানোর নেই কোনও ভাষা...
ভুলকে সে ভুলে ভালোবাসা
সবই যেন ভালো লাগে...'

আঁধার আকাশে তারার মধ্যে চেতনাটা নতুন প্রদীপ জ্বালাবার চেষ্টা করছে। নেই-রঙের তুলিতে আঁকা এক ছন্দ, সুর, গন্ধ মাখা বর্ণচ্ছটায়। মন হাতড়ে বেড়াচ্ছে একটা অস্পষ্ট ধূসর অবয়ব। স্বপ্নের রাজপুত্তুরের বাহ্যিক রূপ। আধো অন্ধকারের মাঝে টিমটিম করে দিয়া জ্বালাতে চাইছে। একটা অস্পষ্ট ছায়াকে ভরিয়ে দিতে চাইছে কায়ার সিল্যুটের মধ্যে মায়ার মোহজালে।

দেখার আকাশে, অদেখাকে কাছে পাওয়ার এক নিভৃত অন্তরের নিঃশব্দ চাওয়া। চাওয়াটা যেন অনন্ত মহাশূন্যে ভাসছে... একটা নতুন রাগের না-লেখা স্বরলিপিতে... আবেগের ঘোরে... ভাষাহীন কোনও সুরে। আমাদের দুজনের সম্মিলিত সুর, নতুন রাগে। সে সুর তো যুগ-যুগান্তরের নিঃশব্দে গেঁথে যাওয়া মালা, অন্তহীন পথে। না-পাওয়া জীবনের রক্তিম অনন্ত রাগে। সুরের ঝর্ণার নিঃশব্দ প্লাবনে।

যেখানে তান মিশে যায় লয়ে। যেখানে মন খুঁজে বেড়ায় দোসর অনাদি কালের পটভূমিতে। যেখানে কাল শুধু বারংবার কষ্ঠিপাথরে যাচাই করতে চায় তাকে, আগুনে। নীরব চাওয়ার মায়াময় বাহুডোরে। দিগন্তে বিস্তৃত শাশ্বত সত্যের রূপে।

অ্যাম্যাঞ্জির কটেজের ডেকে এসে দাঁড়ালাম। সেদিনের মতো আজও পূর্ণিমা। মনে হল আমার চোখের সামনে আস্তে আস্তে সব কিছু লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে... অজস্র তারার দল, বিশাল একলা পূর্ণচন্দ্র, মোহময় আলোয় ভেসে যাওয়া মস্ত আকাশ সব যেন ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে... সমগ্র শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে সৌরিকের থেকে অনেক অনেক অনেক বেশি আচ্ছন্ন করা এক সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী প্রেম নতুন করে অনুভব করলাম।

নবরসের চেয়েও গভীর।

নবরসের চেয়েও নিবিড়।

মধ্যবয়সে নতুন করে গভীর নিবিড় আচ্ছন্ন করা প্রেমের অনভুতি।

এই কি ঈশ্বর?

দু- চোখ ছলছলে। সৌরিককে হারানোর দুঃখে, না কি এই সর্বগ্রাসী প্রেমের উপলব্ধিতে। জানি না। এই বিশালের কাছে আমার মতো তুচ্ছ কারও কী দাম? পরক্ষণে মনে ভেসে এল এক পরম সত্য। জলভরা দু-চোখ আকাশের দিকে তুলে বলতে চাইলাম, আমি চিনেছি তোমাকে প্রভু... আমি প্রাণ দিয়ে বুঝেছি তোমার মহান প্রেমকে। তুমি যদি সত্য হও, তবে আমিও সত্য। তুমি মহতো মহীয়ান হতে পারো, কিন্তু আমাকে ছাড়া কী তোমার চলবে?

'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে...'

সেই মহতী প্রেমের দিক-ভাসানো বন্যায় ভেসে যেতে যেতে শেষবারের মতো ওই পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকালাম...

সব কিছু লুপ্ত হবার আগে কানে ভেসে এল এক মহান দিব্যবাণীঃ

'ঔং পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাত্পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'

চার

রক্তে নাচ।

প্রাথমিক অনুশীলন সম্পূর্ণ করে, মাধ্যমিক উচ্চ-মাধ্যমিক ও অন্যান্য পরীক্ষার জন্য স্থগিত। তারার স্বপ্নটা হঠাৎই বাস্তবে রূপ নেওয়ার জন্য উসখুস করছে। দূর থেকে দেখার নয়। বাস্তবে হওয়ার।

পরিচয়টা এতদিন স্কুল, কলেজ, সুগঠনা দেহের অধিকারিণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সৌরিকের সঙ্গে হৃদ্যতা আমায় কোনও নতুন মাত্রা দেয়নি। কেবলমাত্র মুহূর্তের ভালোলাগার অনুভূতি বিশ্লেষণে। হয়ত ভবিষ্যতের একটা স্বপ্ন ফল্গুধারার মতো ভেতরে ভেতরে কাজ করছিল। আপেক্ষিকতার মধ্যে তখনও প্রাধান্য পায়নি।

আমার সত্ত্বাটা তখন বাইরে আসতে চাইছে। বিশ্ব চরাচরের মধ্যে। নিজস্বতা নিয়ে। সৌরিকের বাইরে আরেক দুনিয়ার সন্ধানে। বুঝতে পারছিলাম, এখন আর আমি ছোট্ট খুকিটি নই। যে বিছানায় শুয়ে মায়ের 'আয় আয় চাঁদমামা...' ঘুমপাড়ানি গানে ভুলে থাকব। বা ছাদের খোলা আকাশে চাঁদ-তারার স্বপ্নে সৌন্দর্যের ক্যানভাসে দিহানের সঙ্গে ছবি আঁকব। ছোটবেলার আবরণটা যেন হঠাৎ খসে গেছে। ঘরের মোহময়ী, নগ্ন, অপরূপা আমি তখন নতুন অলঙ্কার, নিজস্বতার আভরণে সাজতে উন্মুখ। অন্ধকারের আস্তিন সরিয়ে নগ্ন অবয়বটা চাঁদের রশ্মির সাজে ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বল করতে চাইছে নিজ মহিমায়। সহজ অপরূপ অন্য আভরণে।

তার কিছুদিন আগেই বাবা-মার সঙ্গে নর্থ বেঙ্গলে বেড়াতে গেছিলাম। বাগডোগরা থেকে ৯৬ কিমি দূরে দার্জিলিং বাংলোতে। শুনলাম বাংলোটি তৈরি হয়েছিল ১৮৪১ শালে, কবিগুরুর মৃত্যুর ১০০ বছর আগে। অসমের চা বাগানের মালিকদের গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে বিশ্রামের জন্য। বাংলো জুড়ে কলোনিয়াল এরার অ্যান্টিক ফার্নিচার। কাঠের ফ্লোর, সিঁড়ি। শুনলাম সেখানে অনেকেই এসে থেকেছিল। স্যার জর্জ এভারেস্ট, যার নামে মাউন্ট এভারেস্ট, গন উইথ দ্য উইন্ডের নায়িকা ভিভেন লেহ, জুলি ক্রিস্টি, লেডি কার্জন, জর্জ ম্যালারি, অ্যান্ড্রু আরভিন আরও অনেকে।

দোতলা বাংলোর সামনে বাগান, একদিকে আউট হাউসের পাশে বাঁধানো টেরেসে আড্ডা মারার জন্য ওপেন এয়ার লাউঞ্জ। বাগানের গেট যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে সরু রাস্তাটার ওপারে একঝাঁক প্রাচীন পাইন গাছ। ঋজু ভঙ্গিতে গাছগুলো সোজা একশো ফুটের কাছাকাছি উপরে উঠে গেছে। ঝাঁকড়া মাথাগুলো যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে।

আশ্চর্য রঙে ভরে উঠেছে ওপরটা। সূর্যাস্তের পর অজস্র তারা জ্বলছে। সেই আলোয়, একটা নাম-না-দেওয়া রঙে ভরে রয়েছে আকাশ। ঠিক কালো নয়, ধূসরও নয়, কালচে নীলাভ একটা আশ্চর্য রং। বর্ণনাতীত আঁধার রঙে ঢেকে গেছে চরাচর। নীচে শহরের আলো ঝিকমিক করছে। মাঝে মাঝে কুয়াশার চাদর জড়িয়ে নিচ্ছে সন্ধ্যা। চারপাশে ঝিঁঝির ডাক আর পাইনপাতার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের ফিসফিস। সব ছাপিয়ে দিগন্ত বিস্তৃত দেবতাত্মা হিমালয় অটল গাম্ভীর্যে, নির্নিমেষ তাকিয়ে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের বুকে শহররূপ অহমিকার দিকে।

সন্ধ্যা নামতেই ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলল হিমেল চূড়াগুলো। গুটি গুটি পায়ে, গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে সন্ধ্যাতারার আগরবাতি জ্বালিয়ে শান্ত নীরবতার কোলে। স্থির, শিথিল। ওক, দেওদার, পাইনের সমারোহ ছাড়িয়ে, পাহাড়ের বধির বুকে গেয়ে চলেছে রাত জাগা গান।

সেখানেই প্রথম খুঁজে পাই নিজেকে।

কলকাতার ভিড়ে নয়।

পাহাড়ের মতো দৃঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠার নেশা গ্রাস করে ফেলেছে আমাকে। চেনা চৌহদ্দি অতিক্রম করে, ঈশ্বরের বরমাল্যের যোগ্য আরাধনা। একমাত্র এখানেই আমি স্বতন্ত্র হতে পারব, নিজস্বতায়। বাস্তবে তারাদের ধরতে পারব। হয়ত বা তারা হতেও।

একা।

অন্য ভাবে।

তাই সৌরিককে না জানিয়েই হুজুগের বশে দুম করে কোণার্ক ডান্স ফেস্টিভ্যালে নাচার অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়েছিলাম। মনে নতুন ঝড়। কোনও কিছু করে দেখানোর তীব্র জেদ। ভাবতেও পারিনি, ওখানে কোনও দিন নাচবার সুযোগ পাব। জেতা কিংবা হারাটা বড় কথা নয়। আমার মতো নভিসের এই প্রেস্টিজিয়াস ফেস্টিভ্যালে অংশ নেওয়াটাই বড় কথা। আনন্দে শৃঙ্গার যেন পাদমের ঝংকার তুলল মুদ্রার ছন্দে। ওইটাই নাচব।

কোণার্ক!

ডিসেম্বরে শীতের মিঠে আমেজটা উপভোগ করছিলাম। আগের দিন সকালে কলকাতা থেকে ট্রেনে পুরি। গাড়ি নিয়ে কোণার্ক পৌঁছেছি। এসে সারাদিন হোটেলের বিছানায় শুয়েই কেটেছে। ট্রেন জার্নির ধকলে একটু ক্লান্ত। বিছানায় শুয়ে হোটেলের লবি থেকে পাওয়া ব্রশিওরগুলো উলটে-পালটে দেখছিলাম। ২২৮ ফিট উচ্চতার সূর্য মন্দির ইউনেস্কোর হেরিটেজ সাইট। ১২ থেকে ১৫ শতাব্দী এই মন্দিরের প্রাচুর্যের ইতিহাসের সাক্ষী। ১৭ শতাব্দীতে প্রায় বিলুপ্ত মন্দিরের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের কিংবদন্তি কাহিনি তখন শুধুই লোকমুখে। পরে অবশ্য তার পুন:প্রতিষ্ঠা। মন্দিরের বারোটি চক্র বারোটা মাসের প্রতীক। এক একটা চক্রে আটটা স্পাইক এক একটা প্রহর, মানে তিন ঘণ্টা। ঢোকার মুখেই সিংহদরজায় দুটো সিংহ একটা হাতিকে পিষ্ট করছে। পরে জানতে পারলাম, হাতিরূপী মানুষ সিংহরূপ ক্ষমতা আর ঐশ্বর্যের দাস।

১৯৮৬ শালে পদ্মশ্রী গুরু গঙ্গাধর প্রধানের তত্ত্বাবধানে এরই নাট্যমন্দিরে ডান্স ফেস্টিভ্যালের সূত্রপাত। তারপর এত বছর ধরে প্রতি ডিসেম্বর মাসে পাঁচ দিনব্যাপী এই প্রসিদ্ধ ফেস্টিভ্যাল নাট্যমন্দিরে হয়ে আসছে।

আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহলে এতক্ষণ যে ভাস্কর্যের ছবি দেখছিলাম, সেই ছবির সঙ্গে নিজের দেহের গঠনটা মেলাবার চেষ্টা করলাম। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে মুখটা দেখলাম। মসৃণ গালে মেক আপ ছাড়া কোনও দাগ চোখে পড়ল না। চুলটা কাঁধ ছুঁয়ে। আমার চোখের নীলচে আভায় যেন সমুদ্রের ঘোর লাগানো মাদকতা। উদাসীন চোখ দুটো যেন সাগরের ব্যাপ্তিতে স্নিগ্ধ শান্ত নিবিড় দৃপ্ত চাহনিতে ভেদ করতে চাইছে। ছোটবেলা থেকেই ডান দিকের নীচের চোখের পাতাটা একটু বেশি ঝোলা। যৌবনে পাড়ি দেওয়ার সময় এ নিয়ে একটু বিচলিত ছিলাম। কলেজে ঢুকে ভুলে গেলাম। সৌরিক যখন এ নিয়ে প্রশ্ন করেনি, ভাবা কেন? আমার মেদুর চোখের চাহনি পাতার অসংলগ্নতাকে আড়াল করেছে। পাতলা ঠোঁটের ওপর নাকের টিপটা মুখ আন্দাজে একটু ভারী।

সন্ধেবেলা নাচের কম্পিটিশন শুরু। সেদিন আমার নাচ নেই। তাই অন্যদের নাচ দেখছিলাম। একের পর এক নাচ হয়ে যাচ্ছে। ভরতনাট্যম, কত্থক, কথাকলি, মণিপুরি, কুচিপুরি, ওডিসি, মহিনাট্যম। এদের দেখে ভয় করতে লাগল। পারব তো? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম প্রাইজ পাই বা না-পাই, এই আসরে নিজেকে মলিন হতে দেব না।

ফিরে এসে রিহার্সাল। সহযাত্রী শিক্ষক রামগোপাল ভাদুরির তাত্ত্বাবধানে তালিম শুরু। সারা রাস্তায় আসতে আসতে ভেবে রেখেছি ফেস্টিভ্যালে ভরণম নাচব। রামগোপাল স্যার যোগ করলেন পাদ

ভরণম। সেখানে গায়কি অনেকটাই প্রাধান্য পায়। মনে একটু দ্বিধা ছিল। পাদ ভরণম তো অনেকক্ষণের। পারব তো? রামগোপাল স্যার বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আদি তাল যা আট বোলের, আর আট তাল যা চৌদ্দটা বোলের, তফাতটা। আমিও জানিয়ে দিলাম পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ সম্বন্ধে একটু জানি। পূর্বাঙ্গ প্রথম ভাগটা। পল্লবী, মুক্ত পল্লবী আর চিত্ত সরস দিয়ে তৈরি। আর উত্তরাঙ্গ চরণম আর চরণ সরসের ওপর। স্যার খুশি। ঠিক হল পল্লবী কিংবা অনুপল্লবী, মুক্তাই স্বরনম। এরপর পল্লবীটাকে ডবল স্পিড আর ট্রিপল স্পিডে নাচব। সেখান থেকে চলে যাব চরণম-এর আটটা গ্রুপে।

সকাল থেকে লাঞ্চটাইম এক নাগাড়ে তালিম। ভুল হলে স্যার থামিয়ে দিয়ে আবার রিপিট করাচ্ছেন। লক্ষ করিনি রামগোপাল স্যার শুধুই বোলের সঙ্গে আমার হাত ও পায়ের মুভমেন্টস দেখছেন না, আমাকেও দেখছেন। কোণার্ক ডান্স ফেস্টিভ্যালে আগেও বহুবার এসেছেন অন্য অনেক ছাত্রী নিয়ে। আমিই যেন ওঁর কাছে জীবন্ত সূর্যমন্দিরের ভাস্কর্য।

একটু ঘুমিয়ে আবার বিকেল চারটে থেকে রিহার্সাল। শেষ করে মন্দির চত্বরে। সূর্যমন্দির সেজে উঠেছে বছরের নৃত্য মধুর নেশায় বিভোর হতে। মন্দিরের সামনে যে পাথর বসানো বিশাল জায়গাটায় চেয়ার পাতা, সেখানে স্যারকে বসতে বলে আমি একটু চক্কর মারতে বেরিয়ে পড়লাম। স্যার সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। আমিই বাধা দিলাম। ভয়, ইরটিক আর্ট সম্বন্ধে লেকচার দিতে না শুরু করে। রিহার্সালের সময় স্যারের চোখের চাহনি আমার নজর এড়ায়নি।

বেরিয়ে পড়লাম জায়েগাটা ঘুরে দেখতে। কী সুন্দর মন্দিরের ভাস্কর্যের কারুকাজ। মন্দিরের আসল অংশ কিঞ্চিত উঁচুতে। একটা ধাপে সিঁড়িগুলো সাজানো। তামাটে পাথরগুলো আমার যাত্রার তপস্যাভূমি। তার পাশে নাট্যমন্দিরে বর্ণাঢ্য নৃত্য সমারোহের আয়োজন চলেছে। তেরোটা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। তেরোটা সিঁড়ি কেন? প্রশ্নটা বারবার উঁকি দিলেও এ প্রশ্নের উত্তর ক'জন দিতে পারবে বলা মুশকিল। পরে কাউকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া যাবে। তখন ভেতরে যাওয়া মানা। এখন অবশ্য জেনেছি তেরোটা সিঁড়ির গুরুত্ব।

আসল মন্দিরটা অন্যান্য মন্দিরের মতোই। অনেকটা স্পুটনিকের আদলে। মনে হল, প্রতিটা মন্দিরের চূড়া হয়ত কোনও উপগ্রহ থেকে আসা উৎকৃষ্ট জীবদের নিদর্শন। এও মনে হল, এই মন্দিরের চূড়াগুলো ঠিক শিবলিঙ্গের মতো। পৌরুষের বহিঃপ্রকাশ। পৌরুষকে পূজা করাই আমাদের সব ধর্মে শিখিয়েছে। অবলা নারী চিরকালই অবদমিত থেকে গেছে এই পৌরুষের অহং-এ, যতই নারী স্বাধীনতা নিয়ে আন্দোলন করুক না কেন।

নাট্যমঞ্চে একের পর এক নাচ হয়ে যাচ্ছে। দেখে ভয় লাগল। পারব তো? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম এই আসরে নিজেকে মলিন হতে দেব না। ওদের নাচ দেখে রামগোপাল স্যারকে বললাম, কাল থেকে দুদিনে ডবল করে তালিম নেব।

আমার একাগ্রতা, দম দেখে স্যার খুশি। বুঝতে পারলেন শুধু দম-ই নয়, চেষ্টার কোনও খামতিও আমার মধ্যে নেই। সবাই সব কিছুতে মাস্টার না-হতে পারে। চেষ্টা করতে বাধা কোথায়? বুঝিনি আমার প্রতি আকর্ষণটা আরও গাঢ় হচ্ছে। এতক্ষণ শুধু দৈহিক ভাস্কর্যের প্রতি সীমিত ছিল। এখন নিতম্ব থেকে স্তনভাণ্ডের সম্ভার ছাড়িয়ে, ক্রমশ অন্তরে প্রবেশ করতে চাইছে। মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুটা সামগ্রিক। জৈবিক আকাঙ্ক্ষা সংযত করা গেলেও, সামগ্রিক আকর্ষণকে থামানো বড়ই কঠিন।

শীতের ঝরন্ত বিকেলের মৃদুমন্দ বাতাস রিফ্রেশড আমাকে মাতিয়ে দিয়েছে সূর্য মন্দিরের প্রাঙ্গণে। আজকেই আমার দিন। শ্রেষ্ঠ পারফর্ম্যান্স দিতে হবে। নাউ অর নেভার। ঘোরে নেচে চলেছি। পল্লবী থেকে অনুপল্লবী থেকে মুক্তাই স্বরনম থেকে চরণম। একটা মাদকতা। একটা সতেজতা। সারা দেহের প্রতিটা অনুষ্টুপ দিয়ে আঁকতে চাইছি বোল-সংগম-মৃদঙ্গমের চৌদ্দ তালের অর্ঘ্য। সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দিয়েছি শিবের বন্দনায়। এ যেন সূর্য মন্দির প্রাঙ্গণ নয়, দেবরাজ ইন্দ্রের মেহফিল। আমি আর অভিশ্রী নই। হয়ত মেনকা, উর্বশী কিংবা রম্ভা। আমার প্রতিটা শৈলী ছড়িয়ে পড়ছে রঙিন আলোর বর্ণচ্ছটায়। সুর-তাল-ছন্দ মিশে গেছে দেহের ভঙ্গিমার পরিপূর্ণ জৌলুসের পরিস্ফুটনে, বোলের বৃন্দে নৃত্যের তালে তালে।

নতুন রসের ক্যানভাসে আঁকতে চাইছি আমার না-দেখা অচেনা নতুন ছবি।

আমিই চিত্রকর।

আমার মনটাই চিত্রপট।

চিত্রকর আর চিত্রপট যেন এক হয়ে গেছে নতুন তুলির টানে। রূপ, রস, শব্দ, ছন্দ, বর্ণ - সব যেন মিলেমিশে একাকার, নতুন রঙের জাদুর মায়াজালে।

আচমকা হোটেলের ঘরের দরজা খুলে রামগোপাল ভাদুরির প্রবেশ।

এই ধকলের পর সবে মেক আপটা তুলে নিজেকে রিফ্রেসড করতে বাথরুমে ঢুকছিলাম। এখনও ঘোর কাটেনি। কিছুটা আবেগ, কিছুটা উন্মাদনা, কিছুটা পর্যালোচনা, সব রঙের সমন্বয় যেন একটা মোহময় আবেগ সৃষ্টি করেছে আমার ক্ষুদ্র অনুভূতির সংগমে।

আচমকা স্যারকে ঘরে ঢুকতে দেখে একটু অবাকই হলাম। লোকটা কী অচেনা মহিলার ঘরে ঢোকার আগের শিষ্টাচারগুলোও শেখেনি? তবুও গুরু বলে কথা। ভদ্রতা বজায় রাখতে কিছু বলতে পারিনি। একটু একা থাকতে চাইছিলাম। কিন্তু স্যার হঠাৎ করে ঢুকে পড়ায় তা আর সম্ভব নয়। কৃতজ্ঞতা বোধে অবহেলা করা সমীচীন নয়। আফটার অল উনি তালিম দিয়েছেন বলেই তো মনমতো পারফরমেন্স দিতে পেরেছি।

রামগোপাল ডেস্কের সামনের চেয়ারে বসে সেলিব্রেট করতে চাইল। তখনও আমি ঘোরে আচ্ছন্ন। জানি না জিতেছি না হেরেছি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলাম ওঁর দিকে। আমাকে জিজ্ঞেস না করেই রামগোপাল ভাদুরি ফোনে হুইস্কি, খাবারের অর্ডার দিল। সেলিব্রেট করতে চায়। সে তো ভালো কথা। তা বলে হুট করে এভাবে! মেনে নেওয়া ছাড়া আমার আর বিশেষ কিছুই করার ছিল না। আজকের দিনে যদি স্যার আমাকে ট্রিট দিতে চায়, না বলার তো কোনও অবকাশ নেই! আর বলবই বা কেন? আজকে তো আনন্দের দিন। আজকে তো স্বপ্ন পূরণের একটা মুহূর্ত। আজ গুরু বন্দনার দিন। ক্ষুদ্র শখের মজলিসে পূর্ণতার স্বাক্ষর।

হুইস্কি এল। বেয়ারা এল। অর্ডার খাবারও। আমি নিজেকে রিফ্রেসড না করেই গুরুর তালে ছন্দ মেলালাম। আফটার অল পূজার দিনে কী পূজারিকে অবহেলা করা যায়! কখনওই নয়। সূর্যের বন্দনা গানে উচ্ছ্বসিত হলে এই দিনটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকত। কিন্তু শিবের উপাসনা যেন ফেলে আসা সূর্য মন্দিরের রেশ টানতে চাইছে।

আমি গুরুর ছন্দে পা মেলালাম। আজকের উৎকর্ষ, পারফরমেন্স, রামগোপাল স্যারের সাহায্য না পেলে কখনওই সম্ভব হত না। স্যার আমার ভূয়সী প্রশংসা করে যাচ্ছেন। আমি চুপ। হুইস্কিতে

চুমুক দিয়ে রামগোপাল বলে চলেছেন, মন্দিরের ভাস্কর্য দেখে কি আর মন ভরে? কতগুলো প্রিমিটিভ মূর্তির ইরটিক লীলাখেলা। বোধহয় এখান থেকেই গ্রুপ সেক্স-এর কনসেপ্টটা শুরু। শ্রীকৃষ্ণের গোপিনীদের নিয়ে লীলা মাহাত্ম্য। এখানে তো আর গোপিনী নেই। কেবল আমি ছাড়া। একটু থেমে হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে বললেন, আমি সুন্দরের পূজারি... তোমার সৌন্দর্যের পূজারি।

অস্বস্তিতে নড়ে বসেছিলাম। রামগোপালের কথাগুলো যেভাবে মোড় নিচ্ছে, একটুও ভালো লাগছিল না। ঠিক কি করবে, বুঝতে পারছিলাম না। সৌজন্য বজায় রেখে খাওয়ার মাঝখানে স্যারকে তো চলে যেতে বলতে পারি না। তবুও উৎকণ্ঠা, এতদিনের পরিশ্রমের। জিতব না হারব?

রামগোপালের মতে উনি জাজ হলে আমায় ফার্স্ট করে দিতেন। এমন ভরাট চেহারা, এমন দৃপ্ত ভঙ্গিমা, এমন শার্প চোখের চাহনি, যেন সূর্য মন্দিরে শিব আরাধনার কথা ওকে মনে করিয়ে দেয়। আমরা মহিলারা উপোস করে শিবলিঙ্গে দুধ ঢালি। কখনও কী ইচ্ছে হয় না জীবন্ত শিবলিঙ্গে দুধ ঢালতে?

বিরক্ত হয়ে বললাম, সে কথা থাক। স্যার বাধা দিয়ে বললেন, থাকবে কেন? পাথরের মধ্যে কী দেব বন্দনা সম্পূর্ণ হয়? মানুষই তো ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। সব আরাধনার শেষ আরাধনা এই মানুষ। সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই। আজকে জীবন্ত শিবের পূজা সম্পূর্ণ করতে আগ্রহী। চেয়ার থেকে উঠে এসে খাটে বসা আমাকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেল।

আমি অবাক! কী করছেন স্যার! নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য বিছানায় রোল করে অন্য প্রান্তে যাওয়ার চেষ্টা করছি। তখনই রামগোপাল আমার শরীরে আশ্রয় নিল। দুহাত দিয়ে চেপে ধরল আমাকে। সারা দেহ আমার দেহের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে। সমস্ত শক্তি দিয়েও তাকে সরাতে পারছি না। তার হাত দুটো আমার দেহে খেলে বেড়াচ্ছে। গা-টা রি রি করে গুলিয়ে উঠল। ওর ঘন ঘন শ্বাসে বমি পাচ্ছে। পশুটাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছি। দেহের সব শক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। শিথিল হয়ে যাচ্ছে দেহখানা। ওর নেশা তখন তুঙ্গে। মাথা থেকে নীচের দিকে ঘনীভূত হয়ে পতাকার উত্তরণ ঘটাচ্ছে দৃপ্ত বলিষ্ঠ মুক্ত স্বাধীনতায়। যেন মন্দিরের চূড়া তার নিম্নভাগে সদর্পে ইহলোকের জীবন্ত পূজা চাইছে। অনুরোধ নয় - চিরায়ত ধর্মের মতো দৃপ্ত অহংকারে। যুগ-যুগান্তের রক্ষকের আছিলায় ভক্ষকের বেশে।

আর সবুর করা নয়।

দেহের মধ্যে উচ্ছ্বাসের কম্পন, লালসার জাগরণ - টিচার্স হুইস্কির এফেক্টে ঘূর্ণিঝড় তখন সুনামি। সেই উড়িয়ে দেওয়া ঝড়ের উদ্দাম স্রোতে হারিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ অনুভব করলাম, হাল-দাঁড়-হীন ভেসে যাওয়া নৌকোর মতো, আমারও আর কোনও ক্ষমতা নেই। আমি ঘূর্ণিঝড়ের আবর্তে দিশাহারা। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম হারিয়ে যাওয়া ক্ষমতাকে ফিরিয়ে আনতে। শেষ বারের মতো। সেই দিনে আরেকবার।

শুধু এই মুহূর্তটুকু...

সৌরিকের মুহূর্তর সম্পূর্ণ বিপরীত। পরিত্রাণের আশায়।

কোণার্ক মন্দিরের ভাস্কর্যের তৃপ্তি, আমার প্রতিটা কোষে নতুন চিহ্ন এঁকে দিতে চাইছে, বর্তমানের ঔদ্ধত্যে। যদি রামগোপাল পূজারি হয়, আমি কী তবে দেবদাসী?

মুক্তি চাই! মুক্তি চাই!

নিজের শিবকে ভাসিয়ে দিতে চাইছে আমার দুধ সাগরে। আমি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিলাম... অতল সমুদ্রের গভীরে... শিথিল যন্ত্রণার সীমাহীন গহ্বরে... সব বাধা ভেঙে রামগোপালের পৌরুষ যেন সেই আকাঙ্ক্ষিত গহ্বরে মহা সমারোহে শিবরাত্রি উদযাপন করতে চাইছে গুরু বন্দনার সপ্তম নিখাদে। প্রবল ঝড়ের মধ্যে বিশাল নদীতে ছোট্ট নৌকা যেমন দিশেহারা, ওলটপালট হয়ে যায়, ওর বলিষ্ঠ দাপটে, আমিও পালছেঁড়া নৌকোর মতো তেমনই দিশাহারা। আমাকে আঁকড়ে ধরে উচ্ছ্বাসের অন্য মার্গে ভেসে যেতে চাইছে। শুধু প্রবেশ দ্বারের আগল খোলা বাকি! ওর কাছে আমার সুতিহীন দেহটাই যেন সূর্য মন্দিরের আরাধনার বন্দনা গান।

জীবন্ত কোণার্ক!

বৃথাই...

কানের কাছে হিসহিসিয়ে বয়ে চলেছে রামগোপালের দ্রুত শ্বাসের হলকা। কিছুই করার নেই। এলোমেলো ঝড়ে আমার দেহের নৌকা টালমাটাল। হাজার চেষ্টা করেও আর দাঁড় বাওয়ার শক্তি খুঁজে পেলাম না। নিথর দাঁড়হীন নৌকাটাকে সঁপে দিতে বাধ্য হলাম ওর কাতর দেহের কাছে। রামগোপালের দুরন্ত শরীরী বানের কাছে খড়কুটোর মতো ভেসে গেলাম ঘূর্ণিস্রোতে। নিজের করে নিতে না পেরে, সঁপে দিলাম সেই সর্বক্ষম আসুরিক শক্তির অবাঞ্ছিত মিলনযজ্ঞে।

ভোরের আকাশটা আর ভৈরবী গাইছে না। প্রাইজটা আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপ করছে। কোণার্ক ফেস্টিভ্যালটা ম্লান হয়ে গেছে, দুরন্ত ঝড়ের অশান্ত দাপটে। কলা-সঙ্গম মিশে তছনছ, দেবী বন্দনার শপথ থেকে নারীত্বের লুণ্ঠনে। সুপ্ত প্রতিভাকে কে যেন পদদলিত করে সদর্পে এগিয়ে চলেছে কালহীন সময়ের খরস্রোতে। তারা খুঁজতে গিয়ে, তারাকে হাতে পেয়েও, হারিয়ে গেছি জীবন জোয়ারের চোরাবালিতে।

সেদিন আমার অসহায় নারীত্ব শুধু একটাই প্রার্থনা করেছিল আগামী দিনের সূর্যের কাছে 'দোহাই তোমার... আর কেউ যেন কোণার্কের মতো আরেকটা ভাস্কর্য না করে!'

সিলিঙের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে কান্নায় বুকটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। কান্নাটা গলার কাছে এসেও বেরতে পারছিল না। শুধু হাঁসফাঁস করছিল, তারকা হওয়ার নেশার রুদ্ধ কারাগারে। উল্লাস, উচ্ছ্বাস শেষ। লোকের হাততালি, অট্টহাসি পালটে যাবে পরিহাস, বিদ্রুপে।

এর পরেও কী সৌরিকের সামনে দাঁড়াতে পারব? বলতে পারব, যা আগে কখনও বলিনি, তোমাকে ভালোবাসি। আমি যে অপবিত্র হয়ে গেছি আমার এতদিনের লালন করা সংস্কারের কাছে। কী মুখে কার সামনে জাহির করব আমার নিজস্বতা? আমার আমিকে। ওই তারাদের মধ্যে পাশে কি আমার কোনও জায়গা আছে? এক, তারা হওয়া ছাড়া।

এখন মনে হচ্ছে একা অন্য আমিটাই সব থেকে বেশি উজ্জ্বল। ওই দূরের তারাদের ভিড়ের বাইরে।

কটেজের টেরেসে হুইস্কির গ্লাস আর বোতলটা নিয়ে চেয়ারে বসলাম। সেদিনের স্মৃতি ফিরে আসায় গা-টা শিরশির করছে। নবরসের দুঃখ, ব্যর্থতার রসে। কেন? আমাকে কেন রেপড হতে হয়েছিল?

প্রশ্ন করেছিলাম নিজেকে।

আমার ঈশ্বরকে।

জাবাব পাইনি।

হতাশা থেকে ভয়। ঠিক কীসের ওপর জানি না। বোধহয় নিজেকে দেখার। শরীরটা যখন অপবিত্র, মনটাও নিশ্চয়ই তাই হয়ে যাবে। সেই কম বয়সে বোঝার ক্ষমতা, সাহস ছিল না অন্তরকে পরখ

করার যে আমিটা তখনও বিশুদ্ধ, পবিত্র। সেই অন্তরের আমিটাকে যদি তখন সামনে দাঁড় করাতে পারতাম, হয়ত এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পেতাম।

মনন ছিল না।

ক্ষমতা ছিল না।

অন্তরের আমিটাকে দেখার...

পাঁচ

পরের দিন আকাশটা থম।

এখানে ওখানে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের জটলা। নবমীর প্রায়-গোটা চাঁদটা সেই জটলাগুলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। কখনও আলোয় ভেসে যাচ্ছে আকাশ, পরক্ষণেই অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক।

আগে তো এমন দেখিনি। হঠাৎ আকাশজোড়া আলো-আঁধারির খেলা দেখতে দেখতে এক অচেনা শিহরণে শরীরটা কেঁপে উঠল। এই আলো কতক্ষণ থাকবে জানি না। অন্ধকারটাই বা কতক্ষণের তা-ও জানি না। এই অজানাটাই কী ভবিতব্য? ভয়ে কেঁপে উঠলাম। যেমন শিউরে উঠেছিলাম কোণার্ক থেকে ফেরার পর।

রামগোপাল শুধু আমার কুমারীত্ব কেড়ে নেয়নি, আমার আত্মবিশ্বাস, আমার এতদিনের সযত্নে লালিত মান-সম্মান, আমার নিজস্বতাতেও সজোরে আঘাত করেছে। আত্মবিশ্বাস টালমাটাল। তারা ধরতে গিয়ে, তারার বাস্তব রূপ বোঝার আগেই, তাকে মাটিতে দুমড়ে মুচড়ে পিষে দিয়েছে। আকাশে ওড়া ডানামেলা পাখিটাকে আতর্কিতে অজানা শিকলে আবদ্ধ করেছে।

হাঁসফাঁস করছিল।

অসহায় লাগছিল।

অনাকাঙ্ক্ষিত রক্ত প্লাবনে।

রূঢ় বাস্তবের কঠিন আঘাতে।

হাসিখুশি বিহঙ্গের মতো কলকাতার আকাশে ভেসে বেরানো মেয়েটাকে বিবেকের শিকলে বন্দি করে। পৃথিবী তো পরের কথা, নিজের কাছ থেকে পালাব কী করে? একটি ধর্ষিতা মেয়ে কাঠগড়ায় তার বলাৎকারের কাহিনি গেয়ে সামাজিক অনুকম্পা, সুবিচার, ধর্ষকের শাস্তি চাইতে পারে। কিন্তু নিজের কাছ থেকে কি পার পাবে? কিংবা নিকট আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে। সৌরিকের সামনে কী মুখ নিয়ে দাঁড়াব? ওর করুণা ভিক্ষায়? আমার আত্মমর্যাদা কী তাতে আরও বেশি ক্ষতবিক্ষত হবে না? যেন ধর্ষিতা এক নারী আশ্রয় খুঁজছে ছাতার তলায়। উদ্দাম বর্ষার দাপটে দেহ-মন বিক্ষিপ্ত, ছন্নছাড়া। ওর কীসেরই বা দায় এর পরেও আমাকে বরণ করার? এক অর্ধমৃত সত্ত্বাকে জাগ্রত করার?

মুহূর্ত তখন শুধু মুহূর্তেই থেমে। ভালো লাগার মুহূর্তগুলোকে একত্রিত করে ভালোবাসার মালা গাঁথার পালা শেষ। বিয়ে, সংসার, ঘর সে তো পরের কথা। স্মৃতির মালা গাঁথার বাইরে জীবনে তাকে সাজানোর পালা শেষ।

যে দেহলালিত্য নিয়ে অহংকার, সেটা খর্ব হয়েছে অন্য দেহের নিষ্পেষণে। আমি একা দিশাহারা মানসিক শৃঙ্খলের বন্ধনে। প্রবহমান সময়ের ব্যাপ্তিতে ফের জীবনপ্রবাহে ফিরে গেলেও কি মানসিক শৃঙ্খল থেকে অত সহজে মুক্ত হতে পারব?

বর্তমানে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, জানি না।

ভবিষ্যৎ কোন দিকে এগোচ্ছে, বুঝতে পারছি না।

আগামীতে কী হবে, তা-ও জানি না।

সেই বয়সেই জীবন পাখনা মেলার আগে, জীবনের চোরাবালিতে পা-দুটো আটকে গেছে। মনে হয়েছিল সেই চোরাবালি ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে আমাকে। নিয়তির পরিকল্পিত রূপে। চারদিকে বালির পাহাড় যেন সমাধি দিতে চাইছে আমাকে।

পালাবার পথ জানি না।

বাঁচবার পথ জানলেও, দিশাহারা।

আলো-আঁধারি জাগতিক নিয়ম জানলেও মানতে পারছি না। অসহায় আমি রাগে, দুঃখে, হতাশায়, নিজের মধ্যে ছটফট করছিলাম। এই-ই কী জীবন? শুধু অজানা ভবিষ্যতের আশা বা আশঙ্কায় জীবনের একটা বিন্দুতে স্থির হয়ে থাকা। অথবা নিষ্ফল ছোটাছুটি। জীবনের কাছ থেকে কী কিছুই চাওয়ার নেই?

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। ইচ্ছে করেই সৌরিকের ফোনের জবাব দিইনি। কী দেব? নিজের মিথ্যে, মেকি অবয়বটা নিয়ে ফিরে যাব ফ্লোটেলের ডেকে তারা গুনতে? হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তকে আবার নিজের করে পেতে। সৌরিকের রোমশ বুকে মাথা লুকিয়ে কাঁদতে। নিজেকে উজাড় করে ভালোবাসতে। ও কি আমায় গ্রহণ করতে পারবে? গাইতে পারবে রাত জাগা মালকোশ ভাতিয়ারের সুরে? ফিরিয়ে দিতে পারবে আমার জীবনের কলতান? যেখানে মুক্ত বিহঙ্গ বাধাবন্ধনহীন ভেসে বেড়ায় আকাশে। নতুন দিনের সোনালি কিরণের উদ্ভাসে। গান গেয়ে নাম-না-জানা নতুন কোনও সুরে। সে সুর তখনই ছন্দ পাবে যদি দুজনেই অনুভব করতে পারি আগামীর যুগলবন্দি বাস্তবের রাগে।

চোখ তুলে চাঁদের দিকে তাকালাম। পরক্ষণেই মাথা থেকে একটা শীতল ভয়ের স্রোত মেরুদণ্ডর শেষ বিন্দু অবধি বয়ে গেল।

এ-কী!

চাঁদের এ-কী রূপ!

হালকা মেঘের আস্তরণে মোড়া চাঁদটা দেখাচ্ছে অদ্ভুত রকমের লাল। টকটকে লাল নয়। উজ্জ্বল জবাকুসুমসঙ্কাশং লাল নয়। নববধূর সিঁথির সিঁদুরের মতো আশা ভরা লালও নয়। শীতের রাতে ফুটপাথের ঘরহীন গরিব মানুষদের জ্বালানো প্রাণ-বাঁচানো আগুনের মতো লাল নয়। বরং এই লালটা একদিনের বাসি পচা রক্তের মতো গা-গুলোনো লাল। দেখলেই ভয় লাগে। একটা দমবন্ধ করা মৃত্যুভয়।

ঠিক এই অনুভূতির স্পর্শ পেয়েছিলাম যখন নিজেকে গোছানোর পর সৌরিকের সঙ্গে দেখা করি। কী বলব, জানি না। মুখোশ পরে ভান করা আমার রক্তে নেই। তাই সত্যিটাই উগরে দিয়েছিলাম। সৌরিক চুপ। বিস্মিত, না স্তম্ভিত বুঝে উঠতে পারনি। কেউ যখন চুপ করে গুম হয়ে যায়, মনের ভাবপ্রবাহ বোঝা বড্ড কঠিন। আমিও আঁচ করতে পারছিলাম না।

আজকের অচেনা চাঁদনি রাতের মতো, পড়ন্ত শীতের দমকা হাওয়ায় ওড়া শুকনো পাতার মতো থরথর করে ভয়, আশংকায় কেঁপে উঠেছিলাম ওর নিথর, অনুভূতিশূন্য, ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে। কতক্ষণ এভাবে কেটে গেছিল, মনে নেই। দুরু দুরু বুকে শুধু ওর অভিব্যক্তির প্রতীক্ষায়। জীবনের ক্রস রোডে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায়।

এবার কোন দিকে?

ধ্রুবতারাটা শুধু উত্তর দিকই দেখায়। জীবন সহস্র দিকের ফল্গুধারায় শেষে সেই মোহনায় পৌঁছয়, যা আছে ভবিতব্যে।

এখন যেখানে আমি।

একা অন্য।

শেষমেশ সৌরিক কোনও কথা না বলেই মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। মুহূর্তটা মুহূর্তেই নিঃশব্দে ছারখার হয়ে গেল। যদি রেগে ফেটে পড়ত, কিংবা দুঃখে অনুকম্পা দেখাত অথবা সান্ত্বনা দিয়ে আগামীর পথ দেখাত, তাহলে হয়ত এতটা মুষড়ে পড়তাম না।

নাঃ, কিছুই করেনি।

এই নিঃশব্দ প্রকাশটাই অসহ্য। এতদিনের ব্রেনে জমা ভয়টা ধীরে ধীরে শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে নাভিমূলে। বুঝতে পারলাম না সৌরিকের মনের কথা। ও কী তবে মেনে নিতে পারল না? ভাবনাটা জানলে সংশয়টা দূর করা যেত। তা তো জানাই হল না। তাই আরও বেশি ভয়, সংশয়।

নবরসের ভয়ের অনভুতিতে টালমাটাল আমি।

হারানোর ভয়?

সে বয়সে সবারই যা থাকে। আঁকড়ে ধরার অভিপ্রায়। তখন বুঝিনি। আজ বুঝি। ক্ষণভঙ্গুর জীবনে সব কিছুই ক্ষণিকের। সম্পর্কের বেড়াজালও। যে মুহূর্তের মন্ত্রে সৌরিক দীক্ষিত করেছিল, সেটুকই কেবল সত্যি। বাকিটা সামাজিক স্বপ্নের বাস্তব কল্পনা, যা কাঁচের মতো যে কোনও মুহূর্তে চুরমার হতে পারে। ক্ষণিকের চাওয়া সুদূরপ্রসারী নয়। আগামী যখন অনিশ্চিত, দূরের ভাবনাটাকে কাছে টেনে আনলেই মুস্কিল। বন্ধনে জড়াতে চাইলে, আরও সমস্যা। যত বেশি বন্ধন, তত ভাঙার সম্ভাবনা।

বন্ধন না থাকলেই মুক্তি।

বন্ধনহীন পাখিদের মতো। নিজেদের কলতানে মুখর। এখন বুঝতে পারি। পাখিদের মতো উড়তে গেলে, খোলসের বোঝা ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। এই যে অ্যাম্যাঞ্জিতে প্রতিদিন চাঁদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখছি, সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকলে কী পারতাম তা এভাবে আবিষ্কার করতে?

প্রথা ছেড়ে বেরোবার ভয়।

মানুষের একমাত্র আশ্রয়।

যখন সেই আশ্রয় কর্পূরের মতো উবে যায়, সম্পর্কের নগ্নতা লকলকিয়ে ওঠে, তখনই চেনা যায় মুখোশ খোলস ছাড়া অকৃত্রিম রূপটাকে। যেমন চিনেছিলাম মুহূর্তের রঙিন স্বপ্নের ফেরিওয়ালা সৌরিককে। রাগ, অনুকম্পা, বল কোনও কিছুই না দেখিয়ে নীরবে হারিয়ে গেছিল আমার জীবন থেকে। কয়েকবার ফোন করেছিলাম। ফোন তোলেনি। ফোন ব্যাকও করেনি। সেই মুহূর্তের নীরবতা, নিঃশব্দে বিলীন হয়ে গেছিল ভালোলাগার ক্যানভাসে কালি ছিটিয়ে। কলেজে কয়েকবার চলার পথে এলেও, সন্তর্পণে অবজ্ঞা করে এড়িয়ে গেছে। ভাষাহীন ঘৃণা-লাঞ্ছনায়, জনগণের স্রোতে।

পড়ে শুধু আমি।

জীবন সংগ্রামের নতুন স্রোতে।

কুয়াশা মাখা গভীর অন্ধকারে।

নতুন আলোর খোঁজে চাঁদনি রাতে।

একা, অন্য রূপে।

ছয়

কেন জানি না, ঘুম আসছিল না। অ্যাম্যাঞ্জির ইঙ্কলুডেড ভূরিভোজ বোধহয় হজম হয়নি। নাকি, অতীতের ধর্ষণের পর সেই দিনগুলোর স্মৃতি ফিরে ফিরে আসছে। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠছে কান্নায়।

আশ্চর্য!

এত বছর পরেও সেই কলঙ্কিত দিনগুলোর রেশ পিছু ছাড়েনি। ভেতরে কুরে কুরে খাচ্ছে। হঠাৎ নিভৃত একলা অসতর্ক মুহূর্তে ভলক্যানোর মতো বিস্ফোরণ হয়ে তছনছ করে দিতে চেয়েছে বর্তমানকে।

একবার নয়, বারবার।

সুখের স্মৃতি যত তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায়, বেদনা অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করে, চুম্বকের মতো সত্ত্বাকে গ্রাস করতে চায়। ছারখার করে দিতে চায় বর্তমানের ভারসাম্যকে। অতীত যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশে। বুঝতে পারি ধিক ধিক করে তুষের আগুনের মতো জ্বলা ব্যথাটা হারিয়ে যায়নি। গভীর গোপনে ঘাপটি মেরে বসেছিল। অসতর্ক মুহূর্তে ভলক্যানোর স্ফুলিঙ্গ, দাবানল হয়ে ছত্রাকার করে দিতে চায় বর্তমানের সব কিছু, অতীত স্মৃতি রোমন্থনে। ঠিক যেমন আন্দামান আর নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের কাছে ব্যারেন আইল্যান্ডে ১৭৮৭-র দেড়শ বছর পর ২০১৭-তে আবার জেগে উঠেছিল। কিছুই মুছে যায় না। একান্ত ব্যক্তিগত নিভৃত কোণায় ঘুপটি মেরে বসে থাকে। একাকী অসতর্ক মুহূর্তে ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফণা তুলে জানান দেয়, হারিয়ে যায়নি। যদিও করুণাময়ের করুণায় অনেক কষ্টে সে ধকল কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হই।

শিথিল পায়ে হাউজ কোটটা জড়িয়ে টেরেসে এসে দাঁড়ালাম। গভীর রাতের আকাশ অদ্ভুত রহস্যময়। অবাক চোখে দেখছি।

এভাবে তো কখনও আগে দেখিনি।

এভাবে তো কখনও অনুভব করিনি।

এ যেন অজানা অচেনা অন্য এক আকাশ। সারা আকাশ জুড়ে অজস্র তারার দল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ওই তো...ওই দিকে দেখা যাচ্ছে সপ্তর্ষি মণ্ডল। ওই তো ক্যাসিওপিয়া। মাঝ আকাশে দুটি ডানা দু-দিকে ছড়িয়ে উড়ে যাচ্ছে ধপধপে সিগনাস। ওই তো দর্পিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ওরায়ন-কালপুরুষ। একহাতে ধনুক, অন্য হাতে তির। কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে তীক্ষ্ণ তরবারি। কাঁধের কাছে ঝকঝক করছে নীলাভ রিজেল। পায়ের কাছে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে লুব্ধক। সারা আকাশ জুড়ে অজস্র নাম-না-জানা তারাগুলো ভিড় করে ঠেলাঠেলি করছে।

মনে হল, সবাই যেন অধীর প্রতীক্ষায়...

যেন একটু পরেই আসবেন সেই মহান অস্তিত্ব। রাজার রাজা।

অন্য দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত। ওদিকটায় কেমন এক ম্লান আলো ছড়িয়ে রয়েছে। সেই আলোর প্রদীপ হাতে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে এক পরম রহস্যময় চাঁদ। আগে এরকম চাঁদ কখনও দেখিনি। এ যেন অন্য চাঁদ। একটু ম্লান। গেরুয়া-হলুদ আলোর আলখাল্লায় সর্বশরীর ঢেকে আকাশগঙ্গার রাজপথ ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে। সেই আলো যেন সারা আকাশে ছড়িয়ে থাকা তারাগুলোর দিকে দু-হাত বাড়িয়ে বিলিয়ে চলেছে করুণার ঝর্নাধারা। পরম কারুণিক সেই চাঁদ যেন অজস্র নগণ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তারাগুলোকে দু-হাত বাড়িয়ে নিজের আলোর আশ্রয়ে টেনে নিচ্ছে।

মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলাম। এভাবে তো কখনও চাঁদকে দেখিনি। চিরচেনা চাঁদকে এই রূপে তো আগে কখনও লক্ষ করিনি। মনে হল এই চাঁদ আড়াই হাজার বছর আগেকার সেই সর্বত্যাগী রাজপুত্র। পৃথিবীর মানুষ আর মনুষ্যেতর সব প্রাণীর দুঃখে যাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। মানুষের মুক্তির জন্য যিনি সর্বসুখ ত্যাগ করে নিজে তুলে নিয়েছিলেন কাষায় বস্ত্র আর ভিক্ষাপাত্র। কাষায় বস্ত্র পরিহিত সেই পরম কারুণিক বুদ্ধদেব স্বয়ং যেন আজ এই চাঁদের রূপ ধরে আকাশ-শ্রাবস্তির পথে নেমে এসেছেন নিরন্তর দুঃখের আগুনে ধিকিধিকি জ্বলা তারাদের দুঃখের বিষ পান করে তাদের মুক্তি দিতে। আমার দু-চোখ বেয়ে নেমে এল আবেগের সুখসাগরের গভীর থেকে ভেসে আসা মিনতি মিশ্রিত কান্না। যেন ওই বিশ্বজনীন পরম করুণাময়, সেই কান্নার নোনতা জলের স্বাদে সুপ্ত রাগের বহ্নিকে ধুয়ে চিরকালের মতো বুজিয়ে দিচ্ছে প্রশস্ত শান্তির নরম মখমলে। অতীতকে পেছনে ফেলে নব-চেতনার নতুন উদ্ভাসে।

চাঁদের করুণার স্পর্শে সিক্ত, ধৌত আমি নবরসের নতুন করুণাভূতির ছোঁয়ায়। অতীতের রিক্ততা ভুলে বর্তমানের স্নিগ্ধতায়।

আমার আমিকে খুঁজে পাওয়া...

একা, অন্যভাবে।

শহর থেকে দূরে।

ধর্ষণ, সৌরিকের নীরব বিদায় আমার সাজানো দুনিয়াটাকেই ওলটপালট করে দিয়েছিল। না পেরেছি মা-বাবাকে বলতে, না পেরেছি রামগোপালকে শূলে চড়াতে। ভেতরে ভেতরে গুমরে মরেছি চিন্তায়। প্রেগ্রনেন্ট হব না তো? তাহলে তো লুকনো সত্যিটা বেরিয়ে আসবে। ঈশ্বরের অসীম করুণা সে যাত্রায় প্রেগন্যান্সি থেকে বাঁচিয়েছিল। কোণার্কের ঘটনা সম্বন্ধে একমাত্র সৌরিকই জানে, যে আমার থেকে সরে গেছে। চেষ্টা করছিলাম ক্রমশ সৌরিককে মন থেকে মুছে ফেলতে। যত ওর অস্তিত্বটা আমার মনে ধূসর হয়ে আসছিল, ততই ওর অবজ্ঞা, লাঞ্ছনার প্রকাশ আমার কাছে অবান্তর ঠেকত।

কেউ না জানলেও, বেশ বুঝতে পারছিলাম নিজের কাছে নিজেই করুণার পাত্র হয়ে গেছি। দুনিয়ার সামনে কোন মুখে দাঁড়াব? নিজেকে ভুলতে পড়াশোনায় ডুব দিয়েছিলাম। সামনে পরীক্ষা। ভালো ফল না করলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ফল বেরল। সসম্মানে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। অনেক হারানোর মধ্যে ঈশ্বর যেন নোঙরের সন্ধান দিল। আইটিইউ থেকে কেবিনে শিফট করার মতো। ভেন্টিলেটার খুলে নেওয়া হয়েছে বটে। কিন্তু ভেন্টিলেটার ছাড়া কী শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারব? সেটাই পরীক্ষা।

কলেজ থেকে কলকাতা ইউনিভার্সিটি। সৌরিক থেকে অন্য পৃথিবী। মাঝখানের আমির ধামাচাপা দেওয়া আত্মদহন ভুলতে। সৌরিক ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করেনি। শুনেছিলাম ও দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করতে চলে গেছে। কোণার্কের ইতিহাসে পরোক্ষ সাক্ষী কলকাতায় আর রইল না।

অতীতকে পেছনে ফেলে তখন নতুন দুনিয়ায় খোলা। হওয়া উচিত ছিল, পুরনো স্মৃতিকে আর্কাইভে ফেলে এগিয়ে যাওয়া। সবাই যা করে। কিন্তু নিজের থেকে পালাই কোথায়? ইউনিভার্সিটির নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে সাময়িক ভুলে থাকলেও, মুছে ফেলতে পারছিলাম না।

পুরুষ মানেই রামগোপাল।

পুরুষ মানেই সৌরিক।

পুরুষ মানেই বঞ্চনা।

নারীত্ব মানেই লাঞ্ছনা।

নিজের কাছেই আমি করুণার পাত্র।

কেউ যখন নিজের কাছেই করুণার পাত্র হয়, তার আত্মবিশ্বাসটাই চলে যায়। আমারও তাই হয়েছিল। যে আত্মবিশ্বাস, যে নিজস্বতা নিয়ে প্রথম কলেজ জীবনে দাপিয়ে বেড়াতাম, তা কর্পূরের মতো উধাও। ভেতরের ড্রাইভটাও। পড়াশোনা করছি বটে, কিন্তু সেই আগেকার জীবনের অন্যান্য দিকগুলো প্রায় লুপ্ত। নাচ তখন অতীতের এক দুর্বিষহ বেদনার কলঙ্কিত স্মৃতি। ভাবতেও ঘৃণা লাগে।

সেই অধরা তারাকে ধারার নেশাতেই তো আজ আমি এখানে।

সতীত্ব হারানোটা আজ কোনও ব্যাপার নয়। সে যুগেও ছিল না। বলপূর্বক, আত্মরক্ষায় ব্যর্থ ধর্ষিতা নারীর কনফিডেন্সটাই ভেঙে গেছিল। সঙ্গে সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতি অপ্রকাশিত বিদ্বেষ। জানি, সবাই রামগোপাল কিংবা সৌরিক নয়। কিন্তু নারী-পুরুষের ভিতের বুনিয়াদটাই তো টালমাটাল। তখন সেই অস্থিতিশীল ভিতে কী সৌধ গড়ব? ভেতরে নারীত্বের চাওয়া থাকলেও, পুরুষের দেহের স্পর্শে, সারা দেহে এক অজানা কম্পন। অতীতের স্মৃতি যেন আকর্ষণটাকে দলে পিষে দমিয়ে, বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে দেহের প্রতিটা রন্ধ্রে। আমার আপাত শান্তিকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে বদ্ধপরিকর, বুকভরা ক্রোধের আগুনে।

আমার তন্বী, লালিত্যপূর্ণ অবয়ব, আমার বুদ্ধিদীপ্ত, মার্জিত, রুচিশীল, কৃতী ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে যে কিছু ছেলে কাছে আসার চেষ্টা করেনি, এমন নয়। তারা তো সবাই আমার বহিরঙ্গ দেখে আকৃষ্ট। অন্তরে প্রবেশ করতে চায়নি। কিংবা, পারেনি। ব্যভিচারের দ্বারোদ্‌ঘাটন কোণার্কে হয়ে গেলেও, ভেতরের দ্বাররক্ষী সে দরজা তারপর থেকেই বন্ধ করে দিয়েছে। মন্দিরে সবার অবারিত দ্বার থাকলেও, অন্তরের পূজার বেদির দর্শন, তখন ধরাছোঁয়ার বাইরে। ওখানে আমার আমিরই কেবল প্রবেশের অধিকার আছে। আর কারও নয়।

সেখানে আমি, একা অন্য।

সেই আমির গহন অরণ্যে বিরাজমান সংরক্ষিত আরেক সত্ত্বা। বাইরের প্রশংসা কিংবা নিন্দার ঊর্ধ্বে। সন্তর্পণে আচ্ছাদিত আমার আসল আমি। বাইরের ঝড়ঝাপটা থেকে সুরক্ষিত। যাতে তার তাণ্ডব ম্লান না করে দিতে পারে, সযত্নে লালিত অবশিষ্ট বাঁচার প্রেরণাকে।

করুণা করতে পারি নিজেকে। কিন্তু অন্য কারও কাছে করুণার পাত্র হতে চাই না। সেখানে আমার নামের মতোই আমি জ্বলজ্বলে, দৃপ্ত, উজ্জ্বল, ক্ষমতাশালী বলিষ্ঠ। আমার আমিটা বর্মে আচ্ছাদিত অন্তরের গভীর অরণ্যে। নিভৃত গোপনে জাগ্রত হলেও বহির দুনিয়ার কাছে সুপ্ত।

আজ এত বছর পরে অ্যাম্যাঞ্জিতে দাঁড়িপাল্লায় ফেলে আসা জীবনটাকে মূল্যায়ন করার চেষ্টায় নিমগ্ন। জীবনের এক একটি অধ্যায় যেন নবরসের এক একটা অনুভূতি। সেই চেতনায় ক্রমশ সিক্ত হচ্ছি একাকী, এখন এই বয়সে, এখানে বসে, অন্যভাবে। সেদিনের অনুভূতিটা এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে হাস্যকর। গতিপূর্ণ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত নানা চরাই-উতরাইয়ের আঁধারে মূল্যহীন, পাসিং ফেজ। কিন্তু সেদিন জীবনের সন্ধিক্ষণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল দিশা নির্ধারণে।

ভাগ্যই হয়ত দিশার রূপকার। কিন্তু সেই বয়সে ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দেওয়াটা অত সহজ ছিল না। পারিওনি। জ্যোতিষের শরণাপন্ন হয়ে অবশিষ্ট সত্ত্বাটাকে আরও দুরাশায় ফেলতে চাইনি। গোটা পোস্ট-গ্র্যাড সময়ে এই আলো-আঁধারির দোটানায় কখন যে দু-বছর পার হয়ে গেছিল, বুঝতেই পারিনি। না পেরেছি, আর পাঁচজনের মতো হৈ-হুল্লোড় করে সময়টা কাটিয়ে দিতে, না কোনও সুপুরুষের প্রেম বাহুডোরে হাবুডুবু খেতে।

কোনও প্রতীক্ষা নিয়ে নয়। যদি কোনও রাজপুত্র বুদ্ধদেবের মতো জীবন গঙ্গার জনপথ ধরে করুণা শ্রাবণের ধারায় অচিরাবতীর পাড় ছেড়ে, সাহেত আর মাহেত থেকে জীবন-শ্রাবস্তিতে পুনরায় আসে আমার দুঃখের আগুনে ধিকিধিকি জ্বলা দোটানায় চুরমার, ক্ষতবিক্ষত অন্তরে প্রলেপ লাগাতে। পুষ্পবর্ষণে আমার শরীর মনকে সিক্ত করতে নতুন ছন্দের মেঘমল্লারে।

স্নাতকোত্তরে প্রথম হলেও যদি জানতাম, আঁধার এখনও শেষ হয়নি। ভবিষ্যতের অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসেছিল ফল প্রকাশের জন্য। নতুন পরীক্ষার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি না থাকলেও, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা তুচ্ছ করে আমাকে জীবনের জোয়ারে ভাসাতে আরেক অজানা তেপান্তরে।

সেদিনের দুঃখ রোমন্থনে, টেরেস থেকে ঘরে ঢুকে, গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে আবার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ওদিকের করুণাময় চাঁদ এখন সারা আকাশ জুড়ে। তার মন-রাঙানো আভায় ভরিয়ে দিয়েছে আমার আমিকে পরম আশীর্বাদে। হুইস্কির গ্লাস হাতে, ভেজা চোখে চিয়ার্সের বদলে মনে মনে বলে উঠলামঃ

'নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স'

সাত

আকাশের দিকে তাকালাম।

চাঁদটা এককোণে পড়ে আছে বুড়ো ভিখিরির মতো। কুয়াশার চাদরের ফাঁক দিয়ে তাকে দেখাচ্ছে ঘসা কাচের একচোখো চশমার মতো। অনেক বুড়ো ভিখিরি যেমন সুতো দিয়ে বাঁধা একটা ঘসা কাচ পরে থাকে, ঠিক তেমন। তারাগুলো মিলে ভিখিরির মতোই একলা চাঁদটাকে রাতের জলসাঘরের বাইরে ফেলে রেখেছে।

মনে হল একটু পরেই আকাশের সামিয়ানার নীচে শুরু হতে চলেছে মহাকালের বৃন্দসঙ্গীত। সেই আসরে মৃদঙ্গের বোল তুলবে বৃদ্ধ বৃহস্পতি। মন্দিরার ঝংকার উঠবে সপ্ত ঋষিদের হাজার হাতে। অ্যান্ড্রোমিডার বীণার তারে বেজে উঠবে অপার রহস্যময় এক স্থান-কালের গণ্ডি ছাড়ানো মহৎ ছন্দ। তারপর আকাশ মহাকাশ মহাব্যোম জুড়ে ধ্বনিত হবে কালপুরুষের মুখ নিঃসৃত মহাসঙ্গীতের তান। সেই আসরে বিশ্বচরাচরে সবাই আমন্ত্রিত, শুধু একাকি চাঁদটা নয়।

আমার দু-চোখ ছলছল করে উঠল। কোণার্কের পরবর্তী অধ্যায় ঠিক যেমন আমার জীবনের মোড়টা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। চাঁদের একাকিত্বের দুঃখটা আমার নিশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে শরীরে। ছুটছে প্রতিটি শিরা-উপশিরায়। ছুটতে ছুটতে সেটা বদলে গেল রাগে। ভয়ংকর অনির্দিষ্ট রাগ। নবরসের ছন্দ আমার নৃত্য অতিক্রম করে মনে পুঞ্জিভূত রাগের উল্কা ছাড়াচ্ছে।

সামাজিক কাঠামোর ওপর?

চাঁদটার ওপর?

কালপুরুষের ওপর?

তারাগুলোর ওপর?

অন্ধকার রাতটার ওপর?

নাকি নিজের ওপর?

আমার ভাগ্য!...

ঠিক এরকমই হয়েছিল।

একটা অনির্দিষ্ট ভয়ংকর রাগ নিয়ে সেই আধো-অন্ধকার রাতে বসে রইলাম অসীম আকাশের নীচে। অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে।

মাস্টার্স-এ প্রথম হওয়ার পর যখন পিএইচডি-র জন্য তোড়জোড় করছি। বাড়িতে একা বসে অগ্রপশ্চাৎ এলোমেলো চিন্তা। স্বাভাবিক জীবনটা অগোছালো হওয়ার জন্য, ভেতরে একটা তীব্র ক্রোধ। ঠিক কার প্রতি, বুঝতে পারিনি।

রামগোপালের প্রতি?

সৌরিকের প্রতি?

না কি, নিজের প্রতি?

ওরা তো অতীত স্মৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। কবে হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে। কয়েক বছরও পার হয়ে গেছে সেই দুঃখের অভিজ্ঞতা থেকে। স্বাভাবিক নিয়মে সময়ের সঙ্গে তো সে সব মলিন হয়ে যাওয়ার কথা। তবুও হল না কেন? সুপ্ত চেতনার গভীরে বাস করছে বিষধর সাপের মতো। অসতর্ক মুহূর্তে উঠছে ফণা তুলে। তার তাড়নায় আমার সত্ত্বাকে করছি আঘাত। লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছি চেতনার ভারসাম্যকে।

আমার আগামীকে।

কোথায় পরীক্ষার সাফল্যে আনন্দে মশগুল, সবার সঙ্গে মিলে ফুর্তি করব, তা না, নিজের ঘরে একা গুমরে মরছি। তাহলে কী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি? না পারছি প্রবহমানতার সঙ্গে তাল মেলাতে। না পারছি নিজের দুনিয়া রচনা করতে। জীবনটা দোদুল্যমান। মোহনাহীন আগামী কোন অদৃশ্য সুতোয় ঝুলছে। তীব্র আক্রোশে চিৎকার করে ভেঙে দিতে চাইছি সব কিছু। ক্রোধে, আক্রোশে।

চাওয়ার পরিব্যাপ্তিটা ধোঁয়াশা।

পাওয়ার ভাণ্ডারটায় কুয়াশা।

এই ধোঁয়াশা কুয়াশার দোলাচলে ছিন্নভিন্ন জীবন। ছিন্নভিন্ন আমার সমস্ত সত্ত্বা। আমার আমি।

ঠিক আজকের চাঁদটার মতো। অনির্দিষ্ট ভয়ংকর রাগ নিয়ে সেই আধো-অন্ধকার রাতে বসে আছি।

একাকী। ধ্রুবতারার খোঁজে।

হোয়ার ইজ দ্য সং অফ মাই লাইফ?

দ্য রিদম অফ মাই ডিজায়ার্স?

দ্য সোলেস অফ মাই মেলাঙ্কলি?

আই নিউ নট দেন।

সেই অবসরে বুঝতে পারছিলাম না, ধ্রবতারাটাকে দেখতে গেলে যে মনন লাগে, সেটা আমার কেন নেই। অনুভূতির মালা তাকে খুঁজছে। আমার না-চেনা ধ্রুবতারা। মনে পড়ে গেল মা আমায় চিনিয়েছিল। ধ্রুব মানে শিহর। স্ট্যাটিক। খুব কান্না পেয়েছিল। আমার জীবনটা কি তবে স্ট্যাটিক?

বারান্দার বেতের সোফায় গা এলিয়ে আকাশে ধ্রুবতারা খুঁজেছি। ধ্রুবতারা থেকে ল্যাম্প পোস্টের আলো। বাতির মতো জ্বলছে। দূরে অথবা কাছে। মিঠে কুয়াশায় ল্যাম্প পোস্টের আলোটা ফোটনের স্নিগ্ধতার বিন্দু ছড়াচ্ছে। নিঃঝুম নিস্তব্ধ বিশাল উপনগরী। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে ক্লান্ত রাগিণীর শেষ সুর বাজাচ্ছে। অস্তিত্বের পবিত্রতায় ধ্রুবতারাকে দেখার। ছোটবেলায় হারানো কবিতায়ঃ

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার
হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর

কয়েকফোঁটা শিশিরে হিমেল হাওয়ার স্পর্শ। শিহরণ। কম্পন। বাইরের নিস্তেজ আবরণ। নতুন পথের দিশাহীন দোটানায়...

অনেক প্রশ্ন তোলপাড় করছে। অস্তিত্বটা নিজের কাছেই ধোঁয়াশা। দূরের তারাটা দূরেই থেকে গেছে। কাছে এসে ধরা দেয়নি।

আজ বুঝি সেই তারা দু-হাত বাড়িয়ে ডাকছে। তার ডাকে সাড়া না দিয়ে যাব কোথায়? অন্য পথ যে নেই। অঙ্কের বাইরে আবারও অনুভূতির কম্পন। যার শিহরণ যুগ-যুগান্তরে প্রতিটা মানুষের আগামীর পাথেয়। রামধনুর সাতটা রঙের মতো তিনটে রং ক্যালিওডোস্কোপের ছকে ঘোরাফেরা করছে। সেগুলো ধ্রুবতারাকে এক আভরণ পরাচ্ছে। নতুন রূপে, ছন্দে।

ধ্রুবতারা পাল্টায় কি না জানি না। হয়ত নয়। জীবনের এই ক্যালিডোস্কোপে শুধু ধ্রুবতারার আভরণই পাল্টে গেছে। সেই রঙের বাহারে, নতুন স্পন্দনে সুরের মূর্ছনা। আবেগ আর বিচারবুদ্ধির দ্বন্দ্বে। তার টানাপোড়েনেই জীবনের প্রবাহ। বা ফেলে আসা ক্রোধ, ক্লেশ, আক্রোশ, ব্যর্থতার রেশের পরিণতি। এই প্রবাহ-বিরহের দ্বন্দ্ব দোলায় সন্ধ্যাতারার শেষ বাতিটা পাওনার আকাশে জানান দিচ্ছে, জীবনের উত্তরণ বা স্বপ্নের নতুন বাতাবরণ। সম্পর্কহীন, পরিচয়হীন, ভাষাহীন নতুন ঝংকারের অনুরণনে।

একা বসে নিরালা আঁধারে।

আট

পাওনা লেকের আকাশটা অদ্ভুত স্তব্ধতা নিয়ে থম মেরে গেছে। চাঁদ দেখা যাচ্ছে না। পুব আকাশে একটা ঘন মেঘের আস্তরণ ঢেকে রেখেছে তাকে। পশ্চিম আকাশে মেঘ নেই বটে, কিন্তু ওদিকটা ঝকঝকে পরিষ্কারও নয়। একটা ধোঁয়াটে ভাব। ফলে তারাগুলো মিটমিট করে জ্বলছে লো ওয়াটের বাল্বের মতো।

হঠাৎ গা শিরশির করা ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল। উঁচু আকাশেও। চাঁদটাকে লুকিয়ে রাখা মেঘটা হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে নিজের কাপড়-চোপড় সামলাতে ব্যস্ত। চাঁদটাও সেই সুযোগে টুক করে মাথাটা বার করে তার দিকে তাকিয়ে ফিচ করে হেসে উঠল। আমি চমকে উঠে চাঁদটার দিকে তাকালাম। মেঘটার ততক্ষণে কাপড় ঠিক করা হয়ে গেছে। অবাক হয়ে দেখলাম মেঘটা কুমির হয়ে টপ করে চাঁদটাকে গিলে ফেলল। মনখারাপ হয়ে গেল চাঁদটার জন্য। আহা বেচারা! পরমুহূর্তেই চাঁদটা সেই কুমিরের পেট ফাটিয়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে মেঘটা হয়ে গেল একটা ড্রাগন। দাঁত বার করে তেড়ে গেল চাঁদটার দিকে। চাঁদটাও টুপ করে ড্রাগনটার লেজের পেছনে লুকিয়ে পড়ল।

ফিচকে চাঁদটার সাহস দেখে হেসে ফেললাম। মনে মনে বললাম, বাঃ, দারুণ সাহস-তো!

জীবন অন্ধকারের মেঘের আস্তিনে মোড়া, তলানির শেষ প্রান্তে ঠেকে এমনই ভাবে হঠাৎ সাহসটা আমার মধ্যেও জেগে উঠেছিল। নিজের বদ্ধ দুনিয়ায় গুমরানো আমিটা হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়েছিল বাঁচার তাগিদে।

স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পিএইচডি-তে ঢোকবার যখন আয়োজন করছি, হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করে বাবা মারা গেলেন। বেসরকারি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে উঁচু পদেই ছিলেন। ভালো মাইনে। ঠাটবাটে উচ্চমধ্যবিত্ত হলেও, সেই কেতা বজায় রাখতে গিয়ে বেশি টাকা জমাতে পারেননি। কোনও পেনশন নেই। যে পরিবেশে বড় হয়েছি, তার স্ট্যাটাস বজায় রাখতে

ব্যাঙ্কে তেমন রেস্তও নেই। তাই পিএইচডির স্বপ্নের আঁতুড়ঘর থেকে হঠাৎ বাস্তবের পথে। এ অবস্থায় উচ্চশিক্ষার চেষ্টাই বিলাসিতা। রাগ হারিয়ে গেছে। তখন শুধু বাঁচার তাগিদ।

চাকরি চাই। রোজগারের প্রয়োজন। নিজেকে নিয়ে বিলাসিতা থেকে বাস্তবের দোরগোড়ায়। সংসার বাঁচাতে আমদানি চাই।

পেনশন, থোক টাকা, কিছুই পাওয়া গেল না কোম্পানি থেকে। অনুনয় বিনয় করে বাবার সম্মানার্থে বাবার ওই অফিসেই একটা চাকরি পেয়ে গেলাম। নিচু গ্রেডে হলেও, মাসিক রোজগারের একটা সুরাহা হল। সংসার বাঁচল। কিন্তু হারিয়ে গেল রাগ-স্বপ্ন-বিলাসিতা।

রামগোপালের বলাৎকার, সৌরিকের নিঃশব্দে প্রস্থান প্রেমের স্বপ্নকে ধুলিসাৎ করেছিল। তারারা থাকুক ওই দূর আকাশে স্বপ্নের রংমহলে। আমাকে বাঁচতে হবে জীবন সংগ্রামের কঠিন কঠোর ঘরে।

একা, অন্যভাবে।

জীবন যুদ্ধের প্রখরতায়...

দাবদাহ কিরণে।

ফেলে আসা গীত, আর্কাইভে অতীত।

আমার আমিটা তখন গৌণ

শুধুই অন্তরের ব্যথাভরা সংগীত।

সেই গীতবাহারের ডামাডোলে সব ছন্দ, সব রাগ, সব দুঃখ ভুলে তখন শুধুই বাঁচার গান। অন্ধকারের আস্তিন থেকে ফচকে চাঁদের উঁকি মারার মতো, আমিও পরিত্রাণ খুঁজছি তমসাবৃত অস্তিত্ব ভেদ করে আলোর নিশানায়। কোনও মন্ত্র জানা নেই। কেবল বুকের বলটা তখনও সন্ধ্যাপ্রদীপের মতো ধিকধিক করে জ্বলছে। বাইরের উত্তাল ঝঞ্ঝা নিভিয়ে দিতে পারেনি বেঁচে থাকার অদম্য রেশটাকে। সে পথে একাই চলতে হবে। ক্ষতি কী?

যতক্ষণ চলছি, ততক্ষণ আমি আছি। মুছে যাইনি। নবরসের নতুন আলোয় সাহস সঞ্চয় করছি অতীতকে পেছনে রেখে এগোতে।

এই প্রবাহে আমি আজ এখানে। পাওনা লেকের ধারে। সাহসী চাঁদ আর রাগী মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখছি। ঠিক আমার জীবন যুদ্ধের মতো। তারাগুলো হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। টেরেসে দাঁড়িয়ে একাকী দর্শকের মুগ্ধতায় মনে মনে সাহসী চাঁদকে ঐকান্তিক প্রণাম জানালাম।

জানি না, আমার সেদিনের জীবন-যুদ্ধের সংগ্রামকে মা ছাড়া আর কেউ সেলাম জানিয়েছিল কি না। এই যে অবসরে, আর একবার সেদিনের আমিকে দেখতে পারছি, এই বা কম কীসের? অজস্র তারা যে খেলা দেখে উৎফুল্ল, তারা হওয়ার আগেই আমি অ্যাম্যাঞ্জিতে দাঁড়িয়ে অতীতের লুকোচুরি খেলাকে উপভোগ করছি।

নির্লিপ্ত, উদাসীন, আনমনা।

অন্ধকারেও আলোর ঔজ্জ্বল্য দেখতে। অদৃশ্য জগতের রাজপুত্তুরের হাত ধরে স্বপ্নের দেশে। তারাদের সিঁড়ি বেয়ে ঘুমপাড়ানি গানের স্বপ্ন মেখে শুনতে ‘আয় আয় চাঁদমামা...’ মনমাঝির বৈঠা নিয়ে হাতে, সপ্তর্ষির পিঠে চড়ে, আকাশগাং পাড়ি দিতে, কোনও এক অচেনা রূপনগরের দেশে। একান্তই মোহময় অজানার হাতছানি, পার্থিব চাওয়ার অলৌকিক নিঃশব্দ আহ্বান। সেই নৈসর্গিক

স্বপ্নপুরীতে নাম না-জানা তারাগুলো স্বপ্নের দরজা খুলে, আলোর সিঁড়ি বিছিয়ে, স্বপ্ন পরিদের নাচের ভেল্কি দেখিয়ে, গাইছে আরেক স্বপ্ন সংগীতঃ

আমার মনের বইঠা ধর রে তুই নারী
আমি হাজার সমুদ্দুর পার হয়ে তরে ছুঁতে পারি।
ভাসে আমার মন বৈঠার তরী
যেখানে উজলা ফসল ভরে তর ভরা গাঙের বুকে
আমি কেনে নির্জলা তোর পিরিতির সুখে?
তোর মন বইঠা আমি বাইব রে তোর মাঝি।
দেখাইতে তরে স্বপ্ন গাঙের তরী
আমার মনের বইঠা ধর রে তুই নারী
আমারে কোন স্বপ্নের তীরে ভিড়াইলি?

তাদের আলোর প্রদীপের সিঁড়ি বেয়ে, আকাশগাংঙের পথ ধরে, দু-হাত বাড়িয়ে, ওদের দেখানো রাজপথে, ওই ক্ষীণ অথচ দৃপ্ত আলোর দিকে, তারাদের আলোর সিঁড়ি ধরে একা হেঁটে চলেছি। গুটিগুটি পায় আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে মহানন্দে হাততালি দিয়ে হই হই করে উঠে, দ্বিগুণ জোরে মিটমিট করে জ্বলে উঠেছে তারাগুলো। সেই হাজার-লক্ষ আলোয় চারদিকে এক অপূর্ব মায়াময় মূর্ছনা সারা আকাশজুড়ে।

কয়েকটি তারা সেই অন্ধকারের স্বপ্নলোকের সাগরে, এক এক করে জ্বালিয়ে দিচ্ছে ঝিকমিকে আলোর রংমশাল। দু-একটা বড়সড় তারা, ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে ওই আঁধারের বুকে অন্যান্য তারাদের সন্ধ্যারতি দেখছে। কয়েকটা মেজো ধাঁচের তারা, রজপুত্তুরের সঙ্গে আমার মতো সাধারণ মেয়ের উচ্ছল স্বপ্নবিহার দেখে, মিটমিট করে হেসে ছিটিয়ে দিচ্ছে হাজার আলোর ফুলকির উলুধ্বনি। সেই দেখে, বাচ্চা তারাগুলো খিলখিল করে হেসে কুটিপাটি। নৌকোর চারপাশে দাপাদাপি করে, পুকুরপাড়ের উলঙ্গ শিশুদের মতো, ঝাঁপিয়ে পড়ছে আকাশগাঙে স্নান করতে। ঘোরের মধ্যে সেই অচেনা রাজপুত্তুরের হাত ধরে, আকাশগাঙে ভেসে চলেছি জীবন বীণার মালাটাকে আঁকড়ে আমারই স্বপ্ন অনুভূতির মহলে।

স্বর্গ না নরক, জানি না।

বাস্তব-স্বপ্ন মিলেমিশে একাকার।

বেশ বুঝতে পারছিলাম সাহস করে না এগোলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তাই, অতীত ভুলে বর্তমানকে আঁকড়ে ভবিষ্যতের রাজপথের দিকে হাঁটা। প্রেম, বিস্ময়, ভয়, করুণা, রাগ ভুলে অতীতের খোলস পরিত্যাগ করে পোড়ামাটির গর্ভ থেকে ফিনিক্সের মতোই নিজেকে তৈরি করা আগামীর লক্ষ্যে।

চাকরিতে নবতম রিক্রুট হলেও কাজের তৎপরতা দেখে সবাই বিস্মিত। বস-ও। বছর না ঘুরতেই প্রমোশন। তখন শুধু বুকে এগোবার নেশা। আর বদ্ধ ঘরে একাকী গুমরে মরা নয়। গোলি মারো রামগোপালের অতীতকে। চুলোয় যাক সৌরিকের অবজ্ঞা মেশান প্রস্থান। হঠাৎ সব যেন গৌণ হয়ে গেছে আমার জীবনের লাগাম ধরার উন্মাদনায়।

শুরু হয়ে গিয়েছিল মনের ভেতরে, জানা থেকে অজানার পথে ছোটার অশ্বমেধ। ঘোড়া ছুটবে। যেদিকে ছুটবে, সেদিকেই যেতে হবে। একাই খুঁজে নিতে হবে আগামী পথ। সে পথ কোথায় থামবে,

জানি না। শুধু বুঝতে পারছিলাম, সেটাই এগিয়ে যাওয়ার পথ। আমায় একাই বাছতে হবে সে পথের দিশা।

বন্ধনের মধ্যে মুক্তি।

অশান্তির মধ্যে শান্তি।

হারানোর মধ্যে পাওয়ার পরিতৃপ্তি।

সেখানেই আমার জীবনের ব্যাপ্তি।

এই বন্ধনের মধ্যেই তো মুক্তির আনন্দ। যা ঝাপসা হয়ে এসেছিল, সে পথের শেষ দেখার জন্যই অশ্বমেধ শুরু হয়েছিল না-জানা পথে। সেই ঘোড়া যখন এখানে ঠেকেছে। এটাই আমার আগামীর পাথেয়, বাঁচার নতুন মন্ত্র।

আজ এত বছর পর ফিরে দেখা ফেলে আসা পথে। ওই চাঁদের মতো কত ড্রাগনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছি সে ছোটার পথে। কখনও প্রাপ্তির ডালি ভরে। কখনও বিফল মনোরথে। জীবনগাঙে ভেসেছি দুর্বার স্রোতে। অন্ধকার থেকে আলোর নিশানায়। বঞ্চনা থেকে প্রাপ্তির ঘোরে। অর্বাচীন থেকে বুদ্ধিমত্তার অভিষেকে।

তাই তো তারাগুলো আজ হাসছে আমাকে দেখে। গভীর আঁধারে জ্বালিয়ে দিচ্ছে ঝিকমিকে আলোর রংমশাল। আলোকিত পুলকে ভরিয়ে দিচ্ছে অন্তরের আঁধারকে।

নব চেতনার নতুন জাগরণে।

বিজয়ের আনন্দ সাগরে।

এখানেই কী জীবনের পাওয়া?

না কি, আরও কিছু বাকি?

সময়ই বলে দেবে কোনটা সত্য

কোনটা শুধুই ফানুসের মতো ফাঁকি।

নয়

বাইরে রাত। চারধার অন্ধকার।

তারাগুলো অন্য দিনের মতো মিটমিট করছে না। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তারা যেন কোনও কিছুর অপেক্ষায়।

অবাক হয়ে গেলাম। আকাশের, বিশেষত রাতের আকাশের নানা রূপ দেখেছি। কিন্তু আজকের আকাশটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ চোখ পড়ল পুব আকাশে। আগে খেয়ালই করিনি সেদিকটা কখন আলোয় আলোময় হয়ে গেছে। চোখ পড়তেই মনে হল, পূব আকাশটা যেন হয়ে উঠেছে স্বর্গলোকের উৎসব বাড়ির প্রবেশদ্বার। আলোয় সাজানো সেই প্রবেশদ্বারের ভিতরেই ঝলমল করছে মহাআনন্দময় উৎসব।

মুগ্ধ বিস্ময় তাকিয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে উৎসব বাড়ির প্রবেশদ্বারের পর্দা। সেই মহাজাগতিক পর্দার আড়াল থেকে আবির্ভূত হল এক বিশাল মোহময় চাঁদ। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল আনন্দের মহাপ্লাবন। এতক্ষণ স্তব্ধ তাকিয়ে থাকা তারাগুলো হঠাতই মহানন্দে করতালি দিয়ে হইহই করে উঠে, দ্বিগুন আলোয় মিটমিট করে জ্বলতে শুরু করল। জ্বালিয়ে দিল তাদের আলোর বন্যার প্লাবনে এতক্ষণ নিঃশব্দ অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকা ঝোপঝাড়গুলোকে। হঠাতই একসঙ্গে তাদের

সারা গায়ে জোনাকির ফুলঝুরি ধীরে ধীরে আকাশগাঙে আনন্দের মধুকর ডিঙা ভাসিয়ে হাসতে হাসতে মাথার ওপর এসে দাঁড়াল এক অপার্থিব অন্য আনন্দময় চাঁদ।

সেই নৈসর্গিক আনন্দের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে মনটা এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে গেল। মুগ্ধ নিজের মনেই গেয়ে উঠলামঃ

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে,
উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা তোমার, গন্ধসুধা ঢালো।
চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে।
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে,
ডাক পড়েছে কোথায় তারে...

তখন আমি বাঁধ ভাঙা অশ্বমেধের শপথে। রামগোপাল কটা মেয়ের সর্বনাশ করেছে, তার জন্য কোনও শাস্তি পেয়েছে কি না, জানার ইচ্ছে নেই। সৌরিক বিয়ে করেছে কি না, বিয়ে করলে সুখী কি না, সে সব নিয়েও মাথাব্যথা নেই। আমি স্বর্গে না নরকে ভাবার সময়ও নেই। শুধু সাফল্যের নিশানায় এগিয়ে যাওয়া। তারা হয়ে জ্বলব, না আগরবাতি হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাব, না ভাবলেও চলবে।

কাজ, কাজ আর কাজ।

অফিস থেকে সারা ভারত জুড়ে। কখনও বা বিদেশেও। ধাপে ধাপে যত সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠছি, ততই আরেক নেশায় ডুবে যাচ্ছি। মারিজুয়ানার চেয়েও ভয়ানক। সাকসেসের নেশায় তলিয়ে যাচ্ছি এক অন্তহীন মাদক সাগরে।

আনন্দ প্লাবনে।

এই মদিরাতার ছুটে চলা উদ্যমে, একাধিক পুরুষ-মহিলা সহকর্মীর সংস্পর্শে এলেও, একজন-ই বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল চলার আর্কাইভে।

মৌনিস। মৌনিস চ্যাটার্জি।

ঠাটে-বাটে কেতাদুরস্ত সাহেব হলেও মনেপ্রাণে বাঙালি। ৫’৮’’, ক্লিন সেভেন, বয়সে আমার থেকে কিছুটা বড়ই, ডিভোর্সের পর ব্যাচেলার। ইংল্যান্ডে ছোটবেলা কাটানোর দরুন ইংরেজিতে চোস্ত। সব সময় ফিটফাট। হয়ত মনে হতে পারে, এতদিন কারও সঙ্গে না জড়াবার পর, হঠাৎ ওর সঙ্গে কেন? ওর ইংরেজি খোলসের আড়ালে পুরোদস্তুর বাঙালি। ঘনিষ্ঠতা বাড়ার পর ওর নামের মানেটা বুঝিয়েছিল – কঙ্কারার অফ দ্য মাইন্ড। নামের মাহাত্ম্য যে এভাবে কাজ করবে আমার মতো পুরুষ বিদ্বেষীর কাছে, তা আমার কল্পনারও অতীত।

অফিসের কাজে হনলুলু গেছিলাম।

কুহিও বীচের পাশে ওরাই পার্ক শোর ওয়াইকিকিতে থাকার বন্দোবস্ত। ওয়াইকিকি ওয়াহুর সব থেকে ব্যস্ত শহর। হনলুলু এয়ারপোর্ট, যার নাম ড্যানিয়েল কে ইনাউয়ে এয়ারপোর্ট থেকে ২০ মিনিটে হোটেলে। স্কাই স্ক্র্যাপারের মধ্যে হলেও জানলা দিয়ে ওয়াইকিকি বীচের ওপারে অখণ্ড নীল সমুদ্রের বিস্তারে আমি মুগ্ধ। দু-জনের আলাদা ঘর হলেও, দু-ঘর থেকেই সমুদ্র আর ডায়মন্ড হেড ভিউ মুগ্ধ করার পক্ষে কাফি। জানলাম, ওটা ভীষণ পপুলার ডেসটিনেশন।

অ্যালোহা দিয়ে আন্তরিক অভ্যর্থনা। ওরাই জানাল ৫০০ ফিট দূরে হনলুলু চিড়িয়াখানা। চার মিনিটের হাঁটা পথে কাপিওলানি পার্ক যেখানে জগিং ট্র্যাকও আছে। কলকাতায় একো পার্কে আমার নিত্য জগিংঙের অভ্যাস। সেটা এখানেও বজায় রাখতে পারব জেনে মনটা খুশি। হনলুলু ক্লাবে বিজনেস ডিলটার ভার মৌনিসের ওপর। আমি ওকে সাহায্য করার জন্য।

পাথরবাটির নীলের হাতছানি বহুদিনের। মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল ওই অখণ্ডতার গর্ভে। ঝাঁপিয়ে পড়ে নয়। দু-চোখ ভরে আস্বাদন করতে তার সীমাহীনতাকে। হাওয়াইয়ের দক্ষিণে ওয়াহুর প্যাসিফিকে নীলের হাতছানি। সেই সৌন্দর্যের অপরূপ দৃশ্য ক্যামেরার বাইরেও দিগন্তহীন নীলিমাকে বন্দি করতে চাইছিলাম মনের ক্যানভাসে।

দেখতে-দেখতে হারিয়ে গেছিলাম অন্য এক স্বর্গে।

ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখা বাস্তবে।

যেন রাজপুত্তুর আমায় ভেলাতে করে মাঝ দরিয়ার নিয়ে যাচ্ছে অখণ্ড নীলের মাঝে। মুখে দুষ্টু-মিষ্টি হাসি। নিবিড় ভাবে তাকিয়ে আমার চোখের কাজলে। বোঝাতে স্বপ্নের স্বর্গকে পেতে গেলে তো ভাসতে হবে পিরিতির সমুদ্দুরে। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। একলা ঘরে সেই স্বপ্ন বারবার ফিরে ফিরে আসছে মিটিংঙের অবসরে সমুদ্রের নীলের দিকে তাকিয়ে। সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পার কি এই হনলুলু? আমার স্বপ্নের আঁতুড়ঘর? যদি তাই হয়, মৌনিস তবে সেই রাজপুত্তুর। পাশের ঘরে আবছা মৌনিসের মুখটা ভাসছে। যেন হাত বাড়িয়ে ডাকছে। হাত ধরে ভেলায় চেপে হারাতে চাই স্বপ্নের রাজ্যে।

রবিবার ছুটির দিন।

মৌনিসের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম হনলুলুর দ্রষ্টব্য স্থানগুলো। পার্ল হারবার অ্যান্ড ইউএসএস এরিজোনা মেমোরিয়াল, ওয়াইকিকি, লিওন আরবরেটাম আর মানোয়া ফলস, আওলানি প্যালেস, আলা মোয়ানা পার্ক, কুইন এমা সামার প্যালেস, ফসটার বটানিক্যাল গার্ডেন, প্ল্যানেটেরিয়াম আর বিশপ মিউজিয়াম, মিশন হাউস মিউজিয়াম, পু উলাকা স্টেট পার্ক, স্পিটিং কেভ অফ পোর্ট লক দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে বললাম, দিস আর রেমেনেন্টস অফ অ্যামেরিকান অকুপেশন অফ হাওয়াই। হাওয়াইয়ের কিছু ট্র্যাডিশন্যাল দেখতে চাই।

আমি যেন কৃত্রিমতার বাইরে আনস্প্যয়েল্ট ফর্মে বেশি ইন্টারেস্টেড। মৌনিসের সঙ্গে ঘুরে সেটা পেলাম না। সবই মিউজিয়ামগুলোর মতোই অ্যামেরিকান ইনফ্লুয়েন্স সাজানো।

সেখানে হনলুলু নেই।

সেখানে হাওয়াই নেই।

শুধু সদ্য পাঁচমিশালি কালচারলেস কৃত্রিমতার আধিপত্যের জয়ধ্বনি। অথচ আমি আদি অকৃত্রিম সভ্যতার ছবিটাই খুঁজছি। দেশের আসল ক্যানভাস।

দু-জনে দেখতে ছুটলাম ওয়াইকিকি বীচে শনিবার সন্ধেবেলা কুহিও বীচ টর্চ লাইটিং হুলা ডান্স। কোণার্ক ডান্স ফেস্টিভ্যালের স্মৃতি বেদনাদায়ক। তবু রক্তে নাচের বীজটা আজও বিলীন হয়ে যায়নি। তাই আজও নাচের কথা শুনলে মনটা ময়ূরের মতো নেচে ওঠে। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য নৃত্য, যাই হোক না কেন।

ওয়াইকিকি বীচে উলিনিউ আর কালাকাউয়া এভিনিউর সংযোগে কুহিও বীচ হুলা মাউন্ড। ডিউক কাহানমোকুর স্ট্যাচুর কাছে বড় বড় বটগাছের ফাঁকে। ছ'টা থেকে প্রোগ্রাম শুরু। বুঝতে পারছিলাম না

মৌনিস এখানে নিয়ে এল কেন? প্রশ্ন করতেই ও জবাব দিল এটা ফ্রি। প্রাকৃতিক পরিবেশে হুলা নাচ দেখার অন্য মজা।

ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা বাজতেই ভিড়ের মধ্যে থেকে লাল-হলুদ সেরিমোনিয়াল কেপ পরা একজন মধ্যবয়সি লোক এক বিশাল হাওয়াইয়ান শাঁখ বাজিয়ে সূচনা করল। তারপর ধীর সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে বীচের ডায়াসের ধারে এক এক করে মশালগুলো জ্বালিয়ে দিল। তারপর, সূর্যাস্তকে পেছনে রেখে ওই শিখায় শুরু হল সপ্ত রঙে সাজা যুবক-যুবতিদের বাজনার তালে তালে হুলা নৃত্য। কিছুক্ষণ পর কণ্ঠ মিলল বাজনার ছন্দে - আলো ওয়ে, হিলা ওয়ে, পুয়া আহিহি... ছন্দের মধ্যে দেহের বন্দনা।

সূর্যাস্তের আলো-আঁধারে, জ্বলে ওঠা মশালের আলোতে, নানা রং-বেরঙের ছন্দবন্দনা মন্দ লাগছিল না। তবু মনে হল, ওটা কৃত্রিমতায় মোড়া প্রোগ্রাম। মৌনিসকে বললাম, স্পেলনডর থাকলেও লাইফ নেই, যদিও গানগুলো ভালো। নিজস্ব একটা বিট আছে। মন্দ নয়। পুরনো অভ্যাস স্মরণে নাচের মধ্যে কোনও প্রাণ নেই।

আমার শিল্পীমন ছন্দের বন্দনা জানে হৃদয়ের স্পর্শে। কোথাও যেন প্রোগ্রামটা আমাকে ছুঁতে পারছিল না। সেই গভীর কোণে, যেখানে সরগম থেকে নিখাদ মিশে যায় রামধনুর সাত রঙে। যেখানে মন জেগে ওঠে তালের মূর্ছনায়। চোখ ভরে যায় নৃত্যের পশরায়। যেখানে দেহ বসে থাকতে রাজি নয় দর্শকের আসনে। যোগ দিতে চায় ওদের তালে পা মেলাতে অন্তরের ছন্দে।

অতৃপ্ত মনটা আরও কিছু...

হাওয়াইয়ের কোনও ট্র্যাডিশনাল ডান্স প্রোগ্রামে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এক সময় যে সাবেকি হুলা ডান্স হত, এখন সেটা বন্ধ। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান মিশনারিরা হাওয়াইতে এসে সেই নাচ বন্ধ করে দেয়। ওদের ধারণা হয়েছিল, সেই সময়কার হাওয়াইয়ান নাচের কস্টিউম আর জাইরেশন মানুষের মধ্যে সেক্সুয়াল ফিলিংস উদ্রেক করে। যদিও এই নাচ দেবতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। ঠিক আমাদের ভরতনাট্যমের মতো। সেই সংস্কৃতির দেবীপূজা কী করে যে পাদ্রিদের কাছে ইরটিক হয়ে গেল, কে জানে?

ধর্মের নামে ভণ্ডামি। কবে যে ধর্মের নামে সংস্কৃতিকে কিনে নেওয়ার নেশাটা ঘুচবে, কে জানে? আফটার অল রিলিজিয়ান ইজ দ্য হায়েস্ট অর্ডার অফ পলিটিক্স। জানতে পারলাম ওরা হাওয়াইয়ান রয়েলটিকে ক্রিশ্চনিটিতে কনভার্ট করার পর, ওদের রাজা এদেশে ট্র্যাডিশনাল হুলা ডান্স বন্ধ করে দেয়।

তবুও...

মন চাইছে ট্র্যাডিশনাল নাচ দেখতে। নিশ্চয়ই কোনও রিমোট গ্রামে এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি। মৌনিস বোধহয় আমার অতৃপ্তিটা আঁচ করতে পেরেছিল। আমাকে খুশি করতে তাই খুঁজতে বেরল। অবশেষে ছোট্ট একটা গ্রামের খোঁজ পাওয়া গেল হনলুলুর বাইরে সমুদ্রের ধারে। পাকালা ভিলেজ। জানা গেল সেখানে এখনও গ্রামীণ পরিবেশে সাবেকি প্রথা বর্তমান। খবর পেতেই লাফিয়ে উঠেছিলাম। এতদিন শুধু টুরিস্ট অ্যাট্রাকশনগুলোই দেখেছি। এবার নন-টুরিস্ট স্পট দেখার পালা। যদিও জানতে পারলাম সেখানে ভালো থাকার জায়গা নেই।

অবশেষে আমরা হো'আনুআনু বের ধারে পাকালা ভিলেজে পৌঁছলাম। কয়েকশো লোকের বসবাস। বাঁশের মাচার ওপর বাঁশে তৈরি খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘর। চারদিকে নারকেল গাছের সারি। ফাঁক

দিয়ে অকৃত্রিম বিস্তারে সমুদ্র। সিঁড়িতে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলাম। নারকেল গাছের আলোছায়ার ফাঁক দিয়ে সমুদ্দুরের কোলে ঘুমিয়ে পড়ার আগে, সুয্যিমামা ছোট্ট শিশুটির মতো ফিক ফিক করে হাসছে। লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে দূরের সন্ধের সঙ্গে। লাল ধুলো মেখে হুটোপাটি। পালিয়ে বেড়াচ্ছে দূর থেকে ধেয়ে আসা অন্ধকারের আস্তিন গোটানো নীল সমুদ্রের পারে।

মৌনিস ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে ছবি তুলতে বেরিয়ে গেল।

সেই ফাঁকে, এই গ্রামীণ পরিবেশে আমি মনের ক্যানভাসটা মেলে ধরলাম নতুন রঙের খোঁজে। দূর দিগন্তের বেগুনি আভা, সাগরের নীল, নারকেল গাছের সবুজ, সূর্যের হলদে কিরণ, আর নিজের পরা লাল-কমলা স্কার্ট ব্লাউস। কে যেন এক সূত্রে বাঁধতে চাইছে নিজের মনের সপ্ত রঙে। মন ভেসে চলেছে ওই স্বপ্নপরিদের দেশে। মিলেছে মেঠো পথের বাঁকে।

প্রকৃতি যেন নিজের দরজা খুলে ডাক দিচ্ছেঃ

আয়... আয়... আয়...
আয় আমার কোলে।
শোনাব তোকে আজকের গান।
আমার তালে ছন্দ মেলাবি
ভরবে রে তোর মনপ্রাণ।
সমুদ্দুরের সুরে মুখর হয়ে
নতুন সুরের ঐকতান...

সন্ধে নামতেই পুরুষ মহিলারা চারধারে মশাল জ্বেলে *নিউতে*[1] *মাই তাই*[2] নিয়ে বসে পড়ল। ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা দু-জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যারতি শুরু হবে। নাচের তালে প্রকৃতির বন্দনা। কিংবা প্রাচীন দেবতার আরাধনা।

ওদের পরনে গাছের ছাল দিয়ে তৈরি পা'উ, গাছের পাতা, ফুলের লেই, কুকুই নাট। সেই আভরণ ছড়িয়ে পরেছে গলা থেকে হাতের কব্জিতে। পায়ের বেষ্টনীতে ছন্দের বন্দনা, নূপুর নিক্বণে। ওদের কাছেই শুনলাম এই পরিধানের পবিত্রতার কথা। নাচের শেষে এই বেশ তারা অর্পণ করে দেবী লাকার চরণে। ওদের সংস্কৃতিতে পুরুষ মহিলা কারও ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনও আবরণ নেই। মহিলাদের অনাবৃত স্তনে কোনও লিপ্সার আহ্বান নেই। পবিত্র ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ।

ইচ্ছে থাকলেও, মৌনিস ছবি তোলা থেকে বিরত। সাবেকি গ্রামবাসী সভ্যতার অসভ্যতা ভালো চোখে নেয় না। লক্ষ করছিলাম ওই তরুণীদের নিষ্পাপ স্তনের মাধুর্য। যেটা ওদের কাছে দেবী লাকার বরমাল্য। অকৃত্রিম নৈসর্গিক পরিবেশে দৈহিক সৌষ্ঠবের বিশেষ মাধুর্য।

লোকমুখে শুনলাম, এক সময় ওরা এভাবেই থাকত। প্রকৃতির কোলে, প্রাকৃতিক বেশে, গানে-নাচে প্রাকৃতিক বন্দনায় ভরে থাকত ওদের সহজ সরল জীবন। যতদিন না অ্যামেরিকান মিশনারিরা সভ্যতার ভয়াবহ কুটিল থাবায় ওদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করে। কৃষ্টির নামে সাম্রাজ্যের বিকাশ, আর ধর্মের নামে ওদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিলীন করে দিতে এক কাল্পনিক ঈশ্বরকে সামনে খাড়া করে। সভ্যতা এল। সঙ্গে নিয়ে এল মানুষের অন্তরের কুশ্রী নগ্নতা। প্রাকৃতিক সাজে সজ্জিত নারীদের বিক্রি করতে সক্ষম হল ইরটিজমের থাবায়। নিয়ে এল সিফিলিস। নিয়ে এল কুটিল সাম্রাজ্যবাদের

ভয়াবহ অহংকারর উন্মাদ তাণ্ডব। বিক্রি হয়ে গেল ওদের রাজাধিরাজ। বিক্রি হয়ে গেল কোমলতা। বিক্রি হয়ে গেল নিষ্পাপ সারল্যে ভরা বনলতার কোলে বড় হওয়া মাধবীলতা।

বাজনার তালে তালে, সারি দিয়ে নেচে চলেছে কমবয়সি পুরুষ ও নারী। মধ্যবয়সি ও বৃদ্ধরা একপাশে বসে মাই তাই-এর নেশায় ডুবে যাচ্ছে। অদ্ভুত লাগল, কেউ কিন্তু কোনও ধরনের তামাক সেবন করছে না। মাই তাই-এর নেশায় নাচের ছন্দে আমার সারা দেহে আনন্দ অনুভূতির রং ছড়িয়ে, পাকালা গ্রামের দেবী বন্দনায়, মন নেচে উঠল নতুন ছন্দে। আনন্দের স্পর্শ চুমু খেয়ে যাচ্ছে দেহের প্রতিটা কোষে। ডাক দিচ্ছে সভ্যতার নাগপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকৃতির কোলে মিশে যেতে।

একটু তাড়াতাড়ি মাই-তাই খাচ্ছিলাম। মৌনিসই কানে কানে লাগাম টেনে খেতে বলল। এই মস্ত সময়ে, সংযমের কোনও মানেই হয় না। আমার ভেতরে আনন্দের ঐকতান সুর তুলছে ছন্দে হারিয়ে যাওয়ার স্রোতে। জিজ্ঞেস করতে ভিড়ের মধ্যেই ওদের একজন জানাল নাচটাকে অরিজিনালি হুলা কাহিকো বলত, এখন ফর্মটা চেঞ্জড। এও জানাল দে হ্যাভ এ স্ট্রিক্ট লেজিসলেচার। ডিওরিং সেরিমনিস, ইফ এনি মিস্টেক্স আর মেড, ইট ইজ কন্সিডারড ইন দেয়ার ট্র্যাডিশন অ্যাজ এ ভেরি ব্যাড ওমেন। উড বি পানিসড বাই গডেস লাকা।

ঠিক আমাদের ভরতনাট্যমের মতো। কোথায় যেন আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে অদ্ভুত মিল। এক সময় ভরতনাট্যম শিখেছি। দেবতার স্তুতির ঘরানাটাও অনুভব করছিলাম। দুঃখ হল ভেবে, এই সাবেকি ঘরানাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কীভাবে পিষে দিয়ে গেছে ধর্মের নামে।

ভাবনার জটগুলো ক্রমশ শিথিল হচ্ছিল। নেশার ছন্দে আবছা হয়ে আসা নাচের তালেই আনন্দ। উঠে পড়লাম। ওদের দলে ভিড়ে পা মেলাতে উদ্যোগী হলাম। ওরা হাত ধরে কাছে টেনে নিল আমাকে। ঘোরে, ওদের পায়ে পা মিলিয়ে, নিজের আনন্দে নেচে চলেছি।

এখানে কোনও রং নেই, তবু যৌবন আছে।

এখানে কোনও ভড়ং নেই, তবু প্রাণ আছে।

কোনও ছবি নেই, তবু মনের চোখে দেখা আছে।

নাচ শেষ হতে না-হতেই, এক বৃদ্ধা উঠে এসে আমার হাতটা চেপে ধরল। বিড়বিড় করে কী যেন বলে যাচ্ছিল। ওদের ভাষা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। হাতটা ধরেই আছে, কিছুতেই ছাড় ছে না। বিড়বিড় করে বলে চলেছে এনুএনুয়ে *এ... আনা প্যালেমো*[3]। একটু থেমে আবার বলে চলল প্যালেমো *এ... আনা হুলা হুলা*[4]। লা লিও কানে *এ... আনা আলানা*[5]।

আমার হাতে চাপ দিয়ে ওই কথাগুলো বিড়বিড় করে বলতে বলতে এক সময় হাত ছেড়ে গাছের মধ্যে দিয়ে হারিয়ে গেল। মাই তাই-এর নেশা, নাচের ক্লান্তি। সেই অবস্থায় ভাষা বুঝলেও বোধগম্য হত না। পাশের এক ইংরেজিভাষী মেয়ের কাছ থেকে পরে জেনেছিলাম ওই বুড়ি আমার ভবিতব্যের দিকে ইঙ্গিত করছিল। ইংরেজিতে ‘রেনবো উইল সিঙ্ক’‘ডার্কনেস অফ ডান্স উইল কাম’‘সান অফ মিউজিক উইল রাইজ’।

ঘোরে এমনিতেই মাথাটা ঝিমঝিম করছে। মেয়েটির কথাগুলোই ঠিকভাবে বুঝতে পারছিলাম না। ওই কথাগুলো সেই মুহূর্তে সব কিছুকে ওলটপালট করে দিয়েছিল। বুঝতে পারিনি ড্রিঙ্কটা এত স্ট্রং। চাই খড়ের চালের ঘরে গিয়ে শুয়ে একটু ঘুম। বাস্তব থেকে স্বপ্নের দেশে। কিছুক্ষণ আগেই তো ওখানে চলে গেছিলাম। বুড়ি আমাকে হঠাৎ ফিরিয়ে এনেছে বাস্তবের কঠোর আঙিনায়। হয়ত

কথাগুলো নিছক পাগলামি। আবার নাও তো হতে পারে। মনে হল হঠাৎ আমার হাত ধরেই বা পাগলামো করতে যাবে কেন?

জট পাকানো চিন্তা ভুলে *কী-আহ-ভে*[6] খেতে বসে পড়লাম। শেষ করে মৌনিসের সঙ্গে খড়ের চালের ডেরায়। কোনও এক অজানা কারণে মনটা ভারাক্রান্ত। বুড়ির কথায় এক অজানা আশংকায় বুকটা ছটফট করছে।

কীসের ভয়?

কে জানে?

ভয় হয়ত একটাই। সুখের স্বপ্নটাকে ভাঙতে চাইছিলাম না। বেদনাদায়ক অতীতকে পেছেনে ফেলে এসেছি। এখন শুধুই ভবিষ্যৎ। আমিও তো আর পাঁচ জনের মতো স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে চাই বাস্তবকে দূরে সরিয়ে।

খড়ের চালের ডেরায় একটাই ঘর। মানে মৌনিসের সঙ্গে একই ঘরে রাত্রিযাপন। টিমটিম করছে লণ্ঠনের বাতি। মাই তাইয়ের নেশায় জট পাকানো চিন্তা। আনন্দ-আশংকার মাঝে সেসব নিয়ে ভাবার অবস্থা নেই। ডেরার গভীর অন্ধকারে, ড্রিঙ্কের নেশায়, মৌনিসকে ভীষণ কাছে পেতে ইচ্ছে করছে। ওর সুঠাম দেহটাকে আঁকড়ে ঘোরে ডুব দিতে সুপ্ত কামনার উষ্ণ বহ্নির উত্তপ্ত প্রলয়ে। সুনামি রচনা করছে আমার দেহের প্রতিটা কোষে।

জ্বলছে দেহ।

নীরব মন।

চাইছে আলো।

কামনার স্রোতে।

সুনামিটা সমুদ্রের থেকে ঝাপটা দিয়ে কামনার লাভা ছড়াচ্ছে প্রতিটা কোষ জুড়ে।

আর নয়...

আর বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারব না নিজেকে। খাটে শুয়ে আমার দেহে এক মায়াবি ঘোর। নেশার রংটাকে আলো-আঁধারিতে উপভোগ করতে।

জানি না কতক্ষণ!

লাল-কমলা স্কার্ট ব্লাউস খুলে আমি সজ্জাহীন, অপরূপা। শ্যমলা অবয়বটা মৌনিসের চোখের সামনে। দেখছে আমার নিটোল চোখের গাঢ় দৃষ্টি, উষ্ণ অধর, শাঁখের মতো চিবুক, সুন্দর গলা, তুলতুলে জ্যোৎস্নার মতো কান, বিদ্রোহ করা স্তব্ধ স্তন, ঢেউ খেলানো কোমরের মধ্যে দীপ্ত গভীর নাভি। আকর্ষণীয় পরিপূর্ণ নিতম্ব পাহাড়ের বুক চিরে খরস্রোতা নদীর কুলকুল রবে হারিয়ে গেছে কোনও অজানা না-দেখা গহনে...

আমিও হারিয়ে গেছি স্বপ্নের বাসর সজ্জায়। চুমু খেল আমার কপালে। দু-জনের ঠোঁট ক্রমশ গাঢ়। ওর রোমশ উলঙ্গ বুকে, আমার স্তনের দুর্বার চাপ অজানা ছবি এঁকে দিচ্ছে। আমার নিতম্বের স্পর্শে উল্কাপাত। দু-হাতে লেপটে নিলাম ওর দেহ। আঁকিবুকি কাটছি ওর সারা শরীরে। মুক্তি দিতে চাইছি আমার পুঞ্জিভূত কামনা। চিরন্তন আভরণ থেকে নির্বেদ সুতিহীন আলিঙ্গনের প্রতীক্ষায়... সেই মুহূর্তে নিস্তব্ধ আলো-আঁধারির মধ্যে, বাঁধভাঙা বহ্নি ছড়িয়ে গেল দেহের প্রতিটা রন্ধ্রে।

মুক্তি চাই।

এই দেহ, এই মন, এই আবেগ, এই সময়, যেন সেই সুর গাইছে। আকাশ বাতাস, দেহ মন কেঁপে উঠল। আছড়ে গুঁড়িয়ে দিতে এতদিনের একাকীত্বকে। অনাদি বাসনায় আমার উন্মুক্ত দ্বার খুলে...

ঝড় উঠেছে দেহে-মনে-শরীরে উষ্ণতার আকাশে। অতীত ও ভবিষ্যৎ ভুলে হারিয়ে গেলাম বর্তমানের প্রলয়ে। কালচক্র পিছনে ফেলে। আত্মার শ্বাস-প্রশ্বাসে। ঝর্ণার জলপ্রপাতে। শ্বাসের সপ্তম নিখাদ জানান দিল, হারিয়ে গেছি পার্থিব চাহিদার অসীমে।

চরাচরের আনন্দ সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে এই ক্ষতবিক্ষত নশ্বর দেহ নিয়েই আনন্দ হয়ে গেলাম জলপ্রপাতের অতলের ঘূর্ণাবর্তে।

তৃষ্ণার্ত, জাগতিক মরূদ্যানের অন্তঃসলিলে।

দশ

আনমনে আকাশের দিকে তাকালাম।

সন্ধের অন্ধকার রাতের কালোয় মিশে যেতে শুরু করেছে। চারদিকে একটা সাজো সাজো রব। লক্ষ-কোটি তারার দল তাদের ঘরগুলোর বারান্দায় একে একে জ্বালিয়ে দিচ্ছে ঝিকমিকে আলোর রংমশাল। তাদের উচ্ছল হাসি ছড়িয়ে পড়ছে হাজার আলোর ফুলকি হয়ে। নিকষ কালো আকাশে ঝিকমিক করছে অজস্র তারা। সেই তারার আলোয়, কালো আকাশে তৈরি হয়েছে এক অপরূপ মায়াময় মূর্ছনা।

এক আশ্চর্য পরিবেশ।

হঠাৎ চোখ পড়ল পশ্চিম দিগন্তে। আকাশের গায়ে লেগে রয়েছে আধফালি চাঁদ। খুব একটা উজ্জ্বল নয়, আবার একান্ত অনুজ্জ্বলও নয়। আকাশের গায়ে আলগোছে লেপটে থাকা সেই অপার্থিব চাঁদকে দেখে মনে হল, এটা নিতান্ত শূন্য আকাশ নয়। দেবাদিদেব মহাদেবের কপাল। ছবিতে দেখা কোনও হাস্যকর মডেলকে জটা লাগিয়ে সাজানো শিব নয়, বরং এই শিব ভীমরূপী শিব...

মনে পড়ল মন্দিরে শিব বন্দনার মহাপবিত্র শব্দমালাঃ

ওঁ সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়েনমাহ

ওঁ ভবায় জলমূর্তয়েনমাহ

ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়েনমাহ

ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়েনমাহ...

শিবের ধ্যানমন্ত্র মনে আসতেই দু-চোখ বুজে গেল। বারবার মনে মনে আওড়াতে লাগলাম শব্দগুলো।

ইস্পাত রঙের আকাশে মুঠো মুঠো তারার মণিমুক্তো ছড়িয়ে। সোনা ধোয়া জলরঙের অর্ধেক চাঁদটা সদ্যকিশোরীর গোপন আনন্দে মুখ টিপে হাসছে। সেই হাসির রেশ ভেসে ভেসে ছড়িয়ে পড়ছে তারাদের বাড়ির দরজায়, টুক করে টোকা মেরে। বোকাসোকা তারারা দরজা খুলে বাইরে আসার আগেই 'দুয়ো' বলে ভেসে যাচ্ছে চাঁদের হাসির টুকরোগুলো। সারা আকাশ জুড়ে অন্ধকারের ছানাপোনারা সেই আধ-কপালে চাঁদটার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

এভাবে তো কখনও রাত দেখিনি।

বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের যেন সংসারে মন নেই। বেশিরভাগ সময়টাই ঠাকুরঘরে কাটায়। আমি কাজের জন্য বাইরে থাকলে ঠিক মতো খায়ও না। কম বয়সে বাবাকে হারিয়েছি। মনে সর্বদাই

শঙ্কা, মা-র না আবার কিছু হয়... আগে পাড়ার একটা স্কুলে পড়াত। বাবা নিউ টাউনে ফ্ল্যাট কিনে চলে আসার পর সেই কাজটা ছেড়ে দিয়েছে।

যদি আবার সেটা ধরত, একাকীত্ব থেকে মুক্তি পেত। বারবার বলা সত্ত্বেও গা করেনি। আমি কাজে যত উন্নতি করছি, তত কম সময় বাড়িতে। বেশ বুঝতে পারছিলাম মা আরও বেশি একলা হয়ে পড়ছে। কিন্তু কিছু করার নেই। চাকরি বলে কথা। আমার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে। তাছাড়া অতীতের বেদনাময় স্মৃতি ভুলতে, আমারও কোনও কিছুতে ডুবে থাকতে হবে। নইলে আমিও দুঃখের চোরাবালিতে ক্রমশ তলিয়ে যাব।

এই সময় হঠাৎ মা জানাল, আবার স্কুলে পড়াতে চায়। আমি আনন্দে উৎফুল্ল। আমার হাজার ওয়াটের আনন্দকে ফিউজ করে মা জানাল, চাকরিটা এখানে কলকাতায় নয়, বাঁকুড়ায়। ইন্টারনেটে কিছুদিন আগে বাঁকুড়ার শময়িতা স্কুলে টিচারের চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল। ই-মেলে কনফার্মেশন এসেছে। অবাক হলেও বুঝতে পারলাম, মায়ের আর কলকাতা ভালো লাগছে না। বাইরে গ্রামীণ পরিবেশে শান্তি খুঁজছে।

তবু ভালো। ওখানে যদি তৃপ্তি, শান্তি, মুক্তি পায়...

তাই মাকে সেট্‌ল করে দিতে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে বাঁকুড়ায়। শুধু সেট্‌ল করা নয়, ইচ্ছে ওখানে কয়েকদিন কাটিয়ে আসারও। আমারও একটা ব্রেক হবে। আমি থাকলে মায়েরও নতুন জায়গায় সেট্‌ল করতে সুবিধা হবে।

তাই, শময়িতা স্কুল।

গঙ্গাজলঘাঁটি পেরিয়ে অমরকানন। বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত প্রান্তে আধা শহর। ছোট হলেও তুচ্ছ নয়। পৌঁছবার পর জেনেছিলাম, জগদ্বিখ্যাত রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা ছাড়াও আছে বিখ্যাত শময়িতা মঠ। মঠগুরু পূজ্যপাদ শ্রী প্রভুজি মহারাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিনী ধর্মীয় কাজের পাশাপাশি শিক্ষা ও চিকিৎসার সেবাডালি নিয়ে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের মধ্যে। যাঁদের এক বড় অংশই আদিবাসী।

অমরকাননে ঢোকার আগেই চোখে পড়ল দূরে বাঁ দিকে ছবির মতো ছোট্ট পাহাড়। কবি নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত কোরো পাহাড়। উচ্চতার আভিজাত্য নেই। শুশুনিয়া পাহাড়ের মতো অ্যাডভেঞ্চারের হাতছানিও নেই। শান্ত পরিবেশে, নীল আকাশের কোলে, ছোট্ট ত্রিভুজাকৃতি সবুজে মোড়া পাহাড়টির মাথায় দুধসাদা মন্দির। চোখ জুড়ানো ল্যান্ডস্কেপ।

শহর থেকে দূরে এমনই পরিবেশ হয়ত মা খুঁজছিল। কোলাহলহীন নিরিবিলিতে। ঈশ্বরের সাধনায় মন দেওয়ার পরিবেশ। নিজের মতো করে পাওয়ার মুহূর্ত। শান্তি খুঁজতে তাই ওখানে চাকরি।

মেন রাস্তার গায়ে ন্যাশনাল হাইওয়ের তকমা থাকলেও গরিব দুঃখী চেহারা। একদিকে রাস্তা চলে গেছে রানিগঞ্জ হয়ে বীরভূমের মোরগ্রাম, অন্যদিকে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর হয়ে খড়্গপুর। গঙ্গাজলঘাঁটি পেরিয়ে মেন রাস্তা থেকে ডানদিকে মোড় নিয়েছে একসারি দোকানঘরের আড়ালে। একটু এগোতেই প্রচণ্ড গরমে এক পশলা বৃষ্টির মতো হঠাৎ চোখে পড়ল এক ঝলক সবুজ মুক্তি। দু-ধারে সবুজ মাঠ। তার বুক চিরে ডানদিক থেকে বাঁদিকে ছোট্ট শালি নদী। শালি নদীর ছোট ব্রিজ পেরোবার আগেই ডানদিকে বড় গেট। ভেতরে বড় বিল্ডিং। ওটাই শময়িতা মঠ পরিচালিত কনভেন্ট স্কুল। শালি নদীর পাড়ে, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের হাতছানির মধ্যে সাদা স্কুল বাড়িটি দেখে প্রথমেই যে চিন্তা আমার মাথায় এল, আহা রে, যদি এই স্কুলে পড়তে পারতাম! এটাও আমার মিডলটন স্ট্রিট স্কুলের মতো লরেটো

কনভেন্ট। তফাত ওখানে নানরা পড়াত। এখানে তুখোড় ছাত্রীরা পড়ায়। শুনেছি মা-ও পড়াশোনায় দারুণ ভালো ছিল। ইউনিভার্সিটি টপার। আসতে আসতে মা-ই জানাল, নেট থেকে জেনেছে পশ্চিম বাংলার এক কোণায় এই স্কুলের খ্যাতি।

এগোতেই বাঁদিকে অনেকগুলো ছোট-বড় বিল্ডিং। পরে জানতে পারলাম, রণবহালের শময়িতা মঠ পরিচালিত কৃষি ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্কুল। সঙ্গে মাঝারি আকারের হাসপাতাল। বহু মানুষ, সংস্থার দান সাহায্যে গড়া আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসক সহ প্রতিটি কর্মীই ভলানটারি সার্ভিসে। সেবা, একমাত্র সেবাই এদের মন্ত্র। প্রচারবিমুখ সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে কর্মীরাও বিশ্বাস করে জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। জীব সেবাই শিব সেবা।

রাস্তাটা সোজা চলে গেছে রণবহাল গ্রামের দিকে। বাঁদিকে শময়িতা মঠ, ডানদিকে শালি নদী পেরিয়ে দিগন্তে ধোঁয়াটে শুশুনিয়া পাহাড়। ওখান থেকে দেখা না গেলেও শালি নদীর ওপর গান্দুয়া ড্যাম।

হাসপাতালের পরে পরপর ছাত্রীদের হস্টেল, মঠের অফিস, সন্ন্যাসিনীদের থাকার বিল্ডিং। কিছুটা গ্যাপ দিয়ে শান্ত তপোবনের মতো গাছ পরিবেষ্টিত মূল মঠ। গেট দিয়ে ঢুকতেই চোখে পড়ল কতগুলো ছোট ঘর। একপাশে বেড়া দিয়ে আলাদা অতি সাধারণ বাড়ি। প্রভুজি মহারাজের বাসস্থান, সাধনকক্ষ। সাধারণের প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। প্রভুজি মহারাজের আদেশ ছাড়া কেউই ওখানে যেতে পারে না। পরে জানতে পারলাম মহারাজের অসংখ্য ভক্ত। অনেকেই প্রতিদিন বিকেলে আসে মহারাজের দর্শনে। প্রভুজি প্রতিদিন সন্ধের আগে বাইরে বেরিয়ে বাগানে পায়চারি করেন। নিঃশব্দে, জোড়হাতে দাঁড়িয়ে, ভক্তরা নতমস্তকে প্রভুজির আশীর্বাদ নেয়।

কথাবার্তা নেই। নিস্তব্ধতা ভাঙে হাজার পাখির কলতানে। সময় যেন থমকে সত্যযুগের আবহে।

হাসপাতালের পিছনে দোতলা আধুনিক সুন্দর গেস্ট-হাউস। সেখানেই আপাতত মায়ের টেম্পোরারি অ্যাকমডেশন, যদ্দিন না কোয়ার্টারের ব্যবস্থা হচ্ছে। গেস্ট-হাউসের ঘর থেকেই চোখ চলে গেল দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠ, ধানখেতের মখমলে। দূরে কোরো পাহাড়ের হাতছানি। প্রতিধ্বনি করছেঃ

পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ
শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ সর্বে মে
দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ।
তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্ব শান্তিভিঃ শয়মামোহহং যদিহ ঘোরং যদিহ
ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্তু নঃ।

গেস্ট-হাউ সের পেছনে নতুন ফ্ল্যাট। ভক্তরা অনেকেই ফ্ল্যাট কিনেছে শেষ জীবন শান্তির কোলে অতিবাহিত করতে। সব মিলিয়ে নিটোল শান্তির আশ্রয়।

মনটা ভরে গেল।

আহাঃ...

এই পরিবেশে যদি থাকতে পারতাম...

তাহলে হয়ত আজকে অ্যাম্যাঞ্জি বুটিক রিসর্টের কটেজে নিজেকে খুঁজতে আসতে হত না। ওটা একেবারে আইডিয়াল জায়গা। নিজেকে দেখার, চেনার, উপলব্ধি করার। নিজেকে চিনলে, দুনিয়ার লাফালাফি, দাপাদাপিকে সার্কাস ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। নিজের অজানা দিককে নিজের করে পাওয়ার মধ্যেই তো জীবনের সার্থকতা। কে বুঝল, না বুঝল, বয়েই গেল।

অসীমের স্বর্গ তো অজানা রাতের আকাশে নয়। ইহলোকেই। সীমার মধ্যে। শুধু চেনার মনন চাই।

সেদিন কিছুটা বুঝলেও দুনিয়ার র‍্যাট রেস থেকে বেরবার সাহস ছিল না। ইচ্ছেটাও ডানা মেলেনি। মনটাও প্রস্তুত ছিল না। তখন আমি উদ্দাম ঊর্ধ্বগামী নেশায় ধাবমান। নিজের দিকে ফিরে তাকানোর ফুরসত নেই। চাইওনি। অতীতের স্মৃতির জালে বন্দিত্ব থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছি। ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেও নেই।

আমি তখন অশ্বমেধের ঘোড়া।

ছুটছি ধ্রুবতারার নিশানায়।

সেদিন অজানা ধ্রুবতারা আকাশের আঁধারপথে আলো দেখায়নি। শুধু ছুটতে শিখিয়েছে।

আরও... আরও... আরও বেগে...

মোহনাহীন স্বপ্নের সাগরের দিকে।

নিজের বেলাভূমি ভুলে স্বপ্নের বাসরঘরে।

আজ বুঝি তারাদের আকাশগঙ্গার আলোর নদীতে ডুব দিয়ে চাঁদের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে সুপ্ত চেতনার রংমশাল নিজেকে চেনাতে। সীমার গণ্ডির মধ্যে অন্তরের অসীমকে। আঁধার কেটে গেছে। আলোকিত চেতনা মেকি অন্ধকার মুক্ত করে জ্বালিয়েছে দীপশিখা। যার পবিত্র আলোয় চিনতে পারছি নিজেকে। প্রয়োজন নেই অন্য কিছু দেখার। নিজেকে দেখে, চিনে, বুঝলেই তো ঈশ্বর।

আচারে নয়, মনে।

শান্ত, নিবিড় কোণে।

একাকী উন্মোচনে।

এখানেই আগামীর বাঁচার পথ। অচেনা আমিকে দেখার মধ্যেই তো অসীমের স্বাদ। নিজেকে দেখা, চেনা, বোঝার মধ্যেই আলো। অসীমের আঁধারে নয়।

আদেখা আমিকে দেখে ভয়কে জয়ের পথেই পূর্ণতা।

চেতনার উন্মেষেই শান্তি।

এতদিনের অসম্পূর্ণ শিক্ষা এখন সম্পূর্ণ করার অবসর। আত্মার শান্তি, মনের আরাম। সীমা-অসীমের ওপারে মিনোস্কি ডায়াগ্রামের ‘এলস হোয়ার’।

পরম রহস্যময়ের পথ ধরে।

ধীরে ধীরে আমার মনটা ভরে গেল এক আশ্চর্য পরম আশ্রয়দায়িনী শান্তিতে। এই প্রকৃতির কোলেই নিজের মধ্যে পূর্ণতার আলোয় আমার ইহলোক, পরলোক। সব লোকের সমন্বয়ে জাগ্রত অন্তরের মহালোক। অন্তরের প্রণবধ্বনি বোধহয় ক্ষীণ হলেও শুনতে পাচ্ছি।

বাস্তবে মনকে নিতে চায় ইহলোকের স্বপ্নমহলে।

অগম্য পরম প্রশান্তিময় ভূলোকে।

পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা।

ফেরার সময় হয়ে এল।

আদিগন্ত একটা কালো চাদর বিছানো। পরম রহস্যময় কিছুর অস্পষ্ট আভাস জড়িয়ে রয়েছে সেই পর্দার আনাচে কানাচে। ভয় ধরানো সম্ভাবনা। অস্পষ্ট উৎকণ্ঠাময় অপেক্ষা। অথচ সেই কালো

চাদরটার পাগল করে দেওয়া রং। অন্য ঔজ্জ্বল্য। অজস্র তারার চুমকি চুপিচুপি জোনাকি আলো ছড়িয়ে সেই কালোকে আশ্চর্য মোহময়ী করে তুলেছে।

আগে কখনও অমাবস্যার রাতের এই রূপ দেখিনি। দেখলেও খেয়াল করিনি। শহরের স্কাই স্ক্র্যাপারের ভিড়ে কে-ই বা খেয়াল করে একটা রাত কতজনের কাছে কত বিভিন্ন অর্থ বয়ে আনে। কত রকমের ইমোশন। আবার সময়ের স্রোতে কোথায় হারিয়ে যায়। কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ বা মনেও রাখে না। অমোঘ দৃষ্টি নিয়ে রাত তাকিয়ে থাকে। নির্নিমেষ সেই দৃষ্টি কখনও হয়ে ওঠে পরুষ কঠোর, কখনও মমতায় করুণ, কখনও বা দুঃখের আঁচে সজল।

ক'জন জানতে পারে?

আকাশের দিকে তাকালাম।

একটা গুমরে মরা কান্নার রেশ যেন আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে। অক্ষমের হতাশার দীর্ঘশ্বাসের শীতল বাতাস হঠাৎ যেন কোথা থেকে হুহু করে ছুটে এসে আমার চেতনার বহ্নিতে জ্বলা মনটাকে ঘিরে ফেলল। কালো চাদরটার পরতে পরতে জমা অযুত যুগের নিযুত ব্যর্থতার কালো ধুলোর ঝড় হঠাৎ আমার দেহের ফাঁক ফোঁকরে ঢুকে পড়ল। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। অচেনা কান্নার দলা হৃদয়ের অলিন্দ-নিলয় থেকে উঠে এল। সেই কান্নার দলাটা আমার গলা, সুষুম্নার ব্রহ্মনাড়ি বেয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগল স্পাইনাল কর্ড ধরে। উঠতে উঠতে পৌঁছে গেল মস্তিষ্কের কোষে কোষে। আমার স্মৃতির ভাণ্ডারী অ্যামিগডালার অন্দরে। ইমোশনের গোপন কুঠুরিতে।

আমার চেতনায়...

গহন গভীর পরম আপন আত্মার সোনার ঘরে। বুঝলাম না অমাবস্যার রাত কীভাবে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে আমার ঘুমন্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলছে। নতুন আলোর অভিষেকে, গভীর অন্তরালে। ভরা বর্ষার জিয়াভরলীর মতো, পাহাড় থেকে লাফিয়ে নামা সুবনসিরির মতো, অমাবস্যার নিকষ কালো রাত আমার বেপথু মনটাকে এলোমেলো করে, যাবতীয় ইমোশনকে আলুথালু করে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে অজানা গন্তব্যে।

আমার জাগ্রত অবোধ মনটা আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে তলহীন অন্ধকার ঘূর্ণীতে। নব রসের নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত গভীর চেতনার অন্তঃপুরে। সেখানে বেজে চলেছে এক অচেনা রাগ। মালকোষ, দরবারি কানাড়া বা সাহানা আদানা নয়। অন্য অপরিচিত সুর। সোহিনীর মতো মিষ্টি। অথচ সোহিনী নয়। চেনা, অথচ অচেনা।

বেশ বুঝতে পারছি, সেটাই আমার আগামী। কিন্তু জানি না, সেটা কী। ধোঁয়াটে চেতনাটা অমাবস্যার গভীর আঁধারে প্রত্যুষের রশ্মি নিয়ে খেলছে।

গড়তে নতুন রাগের বাহার।

নতুন ধ্রুবতারার আলো।

পুরনো ধ্রুবতারাটা ঢেকে গেছে ওই কালো চাদরটার আড়ালে। নতুন ধ্রুবতারা তখনও নিয়তির ল্যাবরেটারিতে। গাঁথতে সপ্তসুরের রাগ নতুন ছন্দে। অতীতকে বিলীন করে নব চেতনার নতুন উদ্ভাসে। আমার ইহকাল। আমার পরকাল। সব কালের সমন্বয়ে অন্ধকারের হাত ধরে তারাদের মহাকালে। যুগান্তকে অনাবৃত করতে নতুন ছন্দে। ভূলোক ভেদ করে নতুন দ্যুলোকে।

ঘোরাচ্ছন্ন আমি সিলিঙের দিকে তাকিয়ে খাটে শুয়ে।

কনফিউজড।

নবরসের আবেগ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমার জীবনের অতীতকে অনুভব করেছি এই নিভৃত অ্যাম্যাঞ্জি বুটিক রিসর্টের ভিলায়। অবশেষে আশ্রয়দায়িনী শান্তির মন্ত্রে। ঠিক যেমন শময়িতাতে মা শান্তি খুঁজে পেয়েছে। মন্ত্র উপলব্ধি করলেও মায়ের মতো ইহলোকের গন্তব্য এখনও অজানা। তার দিশায় নতুন ধ্রুবতারাটাকে খুঁজছি অন্ধকারের আস্তিনে। নয়ের এই বিশাল ব্যাপ্তিতে তো ধ্রুবতারা নেই। আছে শুধু সংখ্যার খেলা। বিশ্ব চরাচরের ব্যাপ্তির মধ্যে নব নব রূপে। নিত্য নতুন ছন্দে গাইছে।

গণিতের নটি সংখ্যার শেষটি বারবার দেখা দিয়েছে জগৎ প্রকৃতির বিস্তারে। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের ঘূর্ণিচক্রে ইহলোক থেকে মহালকের মহাব্যোমে। শূন্যের ধোঁয়াশার মহাশূন্যে। সেখানে চন্দ্র, সূর্য, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, রাহু, কেতু, শনি নবগ্রহ অন্তরীক্ষ থেকে জীবনকুঞ্জে নিয়তি রচনা করে চলেছে তাদের রশ্মির বিচ্ছুরণে। মাটি, আকাশ, জল, বায়ু, অগ্নি, সময়, ব্যাপ্তি, আত্মা, মন সব উপাদানের উপঢৌকন। যুগ থেকে যুগান্তরে। রচনা করে সত্য (১৪৪০,০০০ বছর), ত্রেতা (১০৮০,০০০ বছর), দ্বাপর (৭২০,০০০ বছর), কলি (৩৬০,০০০ বছর) যুগ, নয়ের সমন্বয়ে। শেখাতে অধ্যাবসায়, বিশ্বাস, নিষ্ঠা, আত্মসংযম, ধৈর্য, ধর্ম, উদারতা, দানশীলতা, জ্ঞানের জাগতিক মন্ত্র। সত্ত, রজ, তম, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সময়, ব্যাপ্তি, কারক মাহাত্ম্যকে নিয়ে নয় গুণের সমাবেশে। বসাতে নবরত্নের সভা। পালন করতে নবরাত্রি উৎসব দুনিয়ার মেহফিলে।

তারপর?

মনের পটে অতীতের পাতাগুলো সবই শূন্য।

অজানা, অচেনা অসীম।

পূর্ণতার বরণডালা খুঁজছে বাস্তবের প্রেক্ষাপটে। মহাব্যোমের মহাশূন্যে শক্তির বিবর্তনে। অন্ধকারের আস্তিনটা যেন সেই চেতনার গুপ্ত গহ্বরে আমাকে নিয়ে খেলছে। কালো গর্তে ঢুকিয়ে নব প্রকাশের রূপ আঁকছে নবজীবনের মন্ত্রোচ্চারণে।

আকাশটা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। অথবা সব কিছুই আকাশ। খুঁজছে নতুন অচেনা অনৈসর্গিক আলোর ঝলমলে বর্ণচ্ছটা। অন্ধকারটা মিশে যাচ্ছে সেই আগমনের প্লাবনে। ওঙ্কারের ‘ম’-এর শেষ ধ্বনি, বারবার ঝংকার তুলছে বিশ্বে। অনুভূতির, চেতনার উন্মোচনে।

অবাক হয়ে সিলিঙের দিকে আমি চেয়ে। অন্ধকারের আস্তিন এখন ঘোর লাগা, হাল্কা কুয়াশার আবরণ। ছোটোবেলায় দার্জিলিঙের ম্যালে দেখা উত্থিত কুয়াশার রিপ্লে। যেন অনন্ত শূন্যের মহাসংগীত শোনাচ্ছে। অনুভূতির ষষ্ঠ মাত্রার আবরণ ভেঙে বেরোতে উদ্যত মহাবিশ্বের প্রথম উদ্ভাসে। তারই জন্মলগ্নে অনুভূত হচ্ছে নতুন রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-বর্ণ-স্পর্শাদি জাগতিক চেতনার নৈবেদ্য সম্ভার। নবজন্মের ঊষালগ্নে ব্রহ্ম তার দ্বার খুলে দিয়েছে স্তবের প্রথম মহামন্ত্রে ‘ওঁ’।

এবার আরোহণের পালা...

[1] নারকেল মালা

[2] হাওয়াই-এর ড্রিঙ্ক

[3] রেনবো উইল সিঙ্ক

[4] ডার্কনেস অফ ডান্স উইল কাম

5 সান অফ মিউজিক উইল রাইজ

6 সি ফুড

আরোহণ

এক

ব্যাক টু ক্যালকাটা।

মৌনিস একটু অসন্তুষ্ট। হঠাৎ না বলে দুম করে চলে গেছি। ও বুঝতে পারে না, প্রত্যেকের জীবনে একটা স্পেস দরকার। আমারও। একাকী নিভৃত ছাড়া নিজেকে দেখা যায় না। কলকাতায় সবার ভিড়ে আমার জীবনে নবরসের ব্যপ্তি কী বিশ্লেষণ করা যেত? নাকি, নবরাগের নতুন সুরের সন্ধান? পঁয়ত্রিশ বছরটা একটা ক্রস রোড। যখন বিয়ে না করে সাংসারিক মায়াজালে জড়াইনি, তখন আগামীর পথ বাছতে তো আত্মবিশ্লেষণ আবশ্যক। অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করে মনের দাঁড়িপাল্লায় মেপে নেওয়া কোনটা আমার আগামীতে বাঞ্ছনীয়। হনলুলুর সেই রাতের সম্ভোগ দৈহিক খিদে সাময়িকভাবে মেটাতে সক্ষম হলেও, মনের খিদে? দুটোর যুগলবন্দি না হলে তো ভালোবাসার সন্ধান পাওয়া যায় না। না পেলে, সাংসারিক পথে হাঁটব না চিত্তের উত্তরণের পথে, বোঝাও মুস্কিল।

নিজের মনটাকে চেনাই মুখ্য। পথ তো চেনার পর। সেই চিনতেই তো গেছিলাম অ্যাম্যাঞ্জি বুটিক রিসর্টে। কলকাতার ভিড়ে অজস্র অস্তিত্বমুখী পিছুটান। অস্তিকে নাস্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেই তো আরোহণের কথা ভাবা যায়। চেতনার ঘনীভবন। নইলে প্রতি পদে নাস্তির হাতছানি। এটাও জানি, অন্তর যুদ্ধে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা সহস্র গুণ। নিয়তির হার-জিতে হাত না থাকলেও, নিজের পথের ঠিকানা খুঁজতে না-ই জড়ালাম সংঘাতে।

তাই অ্যাম্যাঞ্জি বুটিক রিসর্ট।

তাই একাকী রাতের অন্ধকারে...

তাই নতুন ধ্রুবতারার সন্ধানে।

মৌনিস বুঝবে না। ওর কাছে সত্ত্বা মানে যাপনের অঙ্গ। কিন্তু সত্ত্বা তো তা নয়। আপেক্ষিক বাহিরকে দূরে ঠেলে নিজেকে দেখা। তাই চুপিসারে ছুটি নিয়ে কেটে পড়া। সংসারের ঘেরাটোপে নিজেকে জড়াব, না মুক্ত বিহঙ্গের মতো নিজের সত্ত্বার সন্ধান করব। এ বয়সে না করলে, কবে? মেনোপজে পৌঁছবার আগে। তখন জীবনের ব্যালেন্স সিট নিয়ে বসলে তো না মেলারই সমস্যা।

মৌনিসের বিবাহ বিচ্ছেদ অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে। বয়সে আমার থেকে কিছুটা বড়। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। ওরও চিন্তা। এর পর আর ঘর বাঁধা হয় না। বরং লিভিং টুগেদার। সবাই তো রবিশঙ্কর নয়! তফাতটা আমাদের মধ্যে স্পষ্ট।

ও ঘর বাঁধতে চায় নিছক জৈবিক তাড়নায়।

আমার ঘর বাঁধার স্বপ্ন একান্তই মনের আঙিনায়।

উল্কাটা যখন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ ছেড়ে ছিটকে মহাশূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, তখন এমন তো কোনও কথা নেই, আবার উল্টো ফিরে পড়বে পৃথিবীর বুকে?

একই রূপে।

একমাত্র জন্মসূত্রে পাওয়া জাগতিক বন্ধন মা। মা-ও বেশ কয়েকবার ফোন করেছে শময়িতা মঠে কাটিয়ে যেতে। কি কথা আছে। কী এমন কথা যা ফোনে বলা যায় না? সদ্য ছুটি থেকে ফিরেছি।

এখন আবার ছুটি নেওয়া যাবে না। ভাবছিলাম কোনও এক এক্সটেন্ডেড ছুটির উইক এন্ডে ওখানে চলে যাব। মায়ের জরুরি কথা শুনতে। মধ্যাকর্ষণে ফেরার আগে মায়ের সঙ্গে একান্ত কথোপকথনটা প্রয়োজন। সেই অবসরে খুঁজতে হবে আরোহণের সিঁড়ি। পরখ করে দেখতে হবে কোনটা আমার পক্ষে শ্রেয়।

মৌনিসের পক্ষে বোঝা শক্ত। ও নিতান্তই জাগতিক বলয়ে আবদ্ধ।

ও যা দেখে, সেটাই সত্য।

ও যা জানে, সেটাই ঠিক।

ও যা বোঝে, সেটাই পৃথিবী।

সেটাই তো মানব জীবন।

পুজোর জন্য মূর্তি চাই।

অনুভূতির জন্য মানুষ চাই।

বেঁচে থাকার জলজ্যান্ত রসদ চাই।

ওর কাছে স্বর্গ মানে, আর্থিক সম্পূর্ণতা।

ওর কাছে স্বর্গ মানে, সামাজিক সহায়তা।

ওর কাছে স্বর্গ মানে, ফলাও করে অর্থ-সামাজিক উচ্চাশার বড়াই।

স্বর্গকে যে কে বলেছিল দৈনন্দিন পরিমাপে ফেলতে, তা ঈশ্বরই জানেন। রোজকার চাওয়া-পাওয়ার হিসেব-নিকেশে নামিয়ে আনার মধ্যেই বোধহয় কর্তৃত্ব। ওর মধ্যে সর্বাংশে বর্তমান। তাই ওকে না জানিয়ে হঠাৎ উবে যাওয়ায় অসন্তুষ্টি।

ওর কাছে যা বোঝা যায়, তাই স্বর্গ।

ওর কাছে যা চেনা যায়, তাই ধর্ম।

ওর কাছে যা সামাজিক শ্রেয়, তাই জীবন।

সামনে মূর্তি না থাকলে আরাধনা করা যায় না। সামাজিক বলয় না থাকলে বিপন্ন লাগে। ২৪ ঘণ্টা অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য সমাজ-সভ্যতা-জনগণের প্রয়োজন। ওগুলোই মুখ্য।

চেতনার আলোকে অ্যাম্যাঞ্জিতে নিজেকে দেখার পর থেকে ওগুলো আমার কাছে গৌণ। ওখান থেকে ফেরার পর বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমি একটু স্বতন্ত্র হয়ে গেছি। বহির্বিশ্বের কাছে নয়। চেতনার আলোড়নে। সমস্যাটা তাই একান্তই নিজস্ব।

ফুটফুটে জ্যোৎস্না। চাঁদ জ্বলজ্বল করছে। নিউ টাউনের ফ্ল্যাটে বারান্দায় বসে নিঃশব্দে চেয়ে রইলাম জ্যোৎস্নার প্লাবনে। চাঁদের উষ্ণতার মধ্যে এক নিরলস শূন্যতা। তার পথ ধরে একাকী অপেক্ষা। পূর্ণতার গহ্বরে পৌঁছতে। সেখানেই হয়ত জীবনের আসল পাওয়া। কিংবা হারিয়ে যাওয়া। ছোটবেলায় পড়া কবিতাটা মনে পড়ে গেলঃ

হোয়াট ইজ দিস লাইফ ইফ ফুল অফ কেয়ার,
উই হ্যাভ নো টাইম টু স্ট্যান্ড অ্যান্ড স্টেয়ার
নো টাইম টু সি দ্য উডস্ উই পাস
হোয়ার বার্ডস্ হাইড দেয়ার নেস্টস্ ইন গ্রাস

সত্যিই তো। এই জীবনের মধ্যে কত ছন্দ। পার্থিব জীবনের আনন্দ। অজানা অচেনা দুনিয়ার হাতছানি। অনুভূতির মধ্যে। তাকে চেনার নেশায়, মন নেচে উঠছে। দূর নীলিমায় যেখানে দিগন্ত মেশে অসীম অনন্তের মধ্যে, খুঁজতে পাওয়ার ছন্দ। পার্থিব জীবনে বাঁচার অবিরল নিষ্কলুষ আনন্দ। ছুটি পেলে, তার খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে এখানে-ওখানে। বাউলের সুর, পাহাড় সাগরের টানে। প্রকৃতির নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ নিজ নিজ ছন্দে। তাই, থাকব না আর বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে। দেখার আবেগে আকর্ষণ বাড়ছে।

কাছ থেকে রূপ, রস, গন্ধ, ছন্দকে আস্বাদন করতে।

তারপর ভাবা যাবে সংসার না বৈচিত্র্য। কোনটা আসল জীবন। কোনটা আমার পক্ষে শ্রেয়।

জ্যোৎস্না প্লাবিত আকাশের দিকে চেয়ে মনে হল, এই দেখা না হলে তো আরোহণের হদিস মিলবে না।

দুই

ড্রাইভটা মন্দ লাগছে না। যদিও শময়িতা মঠ প্রায় চার ঘণ্টার ড্রাইভ। ট্রেনে যেতে পারতাম। কিন্তু হাইওয়েতে ড্রাইভ করার অন্য আনন্দ। গাড়ি থাকলে স্বাধীনতাও অনেক বেশি। গতবার মাকে যখন পৌঁছতে গেছিলাম, সেভাবে দেখা হয়নি রনবহাল অঞ্চলটা। শালি নদী পেরিয়ে শুশুনিয়া পাহাড়, গান্দুয়া ড্যাম। বাংলায় উর্বর প্রকৃতির অন্য রূপ।

চিরকালই প্রকৃতি আমার প্রিয়। আগে ছুটি পেলেই প্রকৃতির মাধুর্য আস্বাদন করতে বেড়িয়ে পড়তাম। কাজের ফাঁকে ডে বা উইক এন্ড ট্রিপেও প্রকৃতির কোলে। প্রকৃতির মধ্যে একটা নৈসর্গিক স্পন্দন আছে। নতুন ছন্দ সৃষ্টি করে দেহে, মনে। শান্ত করে চঞ্চল হৃদয়।

দু-ধারে বিস্তৃত সবুজের সমারোহ। এক্সপ্রেস হাইওয়েতে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে ছুটে চলেছে আমার ভোক্সওয়াগন ভেনটো গাড়িটা দু-পাশের সবুজের মাঝখানে। আমার একটাই দোষ। স্টিয়ারিং হাতে পড়লে গতি স্বর্গ, গতিই ধর্ম। এই ছোটাতেই আনন্দ। প্রাণের স্পন্দন প্রকৃতির মধ্যে। মুহূর্তকে বরণ করে নেওয়ার অনাবিল ছন্দের প্লাবন। ইট-কংক্রিটের বাইরে। মিষ্টি রোদে সবুজের মেলার মাঝে সোজা ন্যাশনাল হাইওয়ে। স্টিরিওতে বাজছে আমার পছন্দের রবীন্দ্রসংগীতঃ

আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।

খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত

শক্তিগড়ের ল্যাংচা মহলে হল্ট। ল্যাংচা আমার ভীষণ প্রিয়। এ-পথে এলেই পুরনো দোকানটায় ঢুকে পড়ি। মায়ের জন্য এক হাঁড়ি কিনে ফেললাম। ফেরার সময় নিজের জন্যও নিয়ে যাব। এই ছোট ছোট আনন্দ একান্তই আপনার।

মা দেখা করতে চাইছে কেন? নিশ্চয়ই কিছু সিরিয়াস। নইলে তো ফোনেই বলতে পারত।

বাবার কাছে শুনেছি মা স্কুলজীবন থেকেই পড়াশোনায় দারুণ ভালো ছিল। কারমেল কনভেন্টের ছাত্রী। বাবার সঙ্গে আলাপ প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সময়।

প্রেম, বিয়ে, আমি।

ছোট্ট হলেও সুখী সংসার।

সেই সুখের প্রবহমানতায় ইতি টানল রামগোপাল। পরে সেই দুঃখের ক্যানভাসে সৌরিকের অন্য রং। এখন মৌনিসকে দোটানায় ঝুলিয়ে জীবন খুঁজতে। যেন ফেলে আসা অতীতকে আর্কাইভে ফেলে

নিজেকে খোঁজার পর্বত আরোহণের পূর্বে সমতলে। আরোহণ কবে সমাপ্ত হবে অজানা। ততদিন মৌনিস পেন্ডুলামে। কতদিন ঝুলতে পারবে, সেটাই কী ওর একাগ্রতার পরীক্ষা? অনেক সময় ভাবি, কে আমায় অধিকার দিয়েছে ওকে পরীক্ষা করার? পর মুহূর্তে মনে হয়, আমি তো ওকে বিচারের দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বসিনি। বরং নিজেকে চেনার, বোঝার। সেই প্রতীক্ষায় ও যদি ঝুলে থাকে কিছু করার নেই। নিজের পেন্ডুলামটা স্টেডি না করে ওর লাগাম ধরাটা বোকামি। সব কিছু আরও কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে।

শময়িতা মঠে যখন পৌঁছলাম, তখন একটা বেজে গেছে। এবার আর গেস্ট হাউস নয়, দু-কামরার কোয়ার্টার। মা আর দেরি না করে খেতে বসিয়ে দিল। এলাহি রান্না। দু-রকমের মাছ, মাংস। উইক এন্ডে ছুটি বলে সময় পেয়েছে। খেয়ে ঘুম। ঠান্ডা মাথায় সন্ধেবেলা মায়ের কথা শোনা যাবে।

ঘুম থেকে যখন উঠলাম, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। মা চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে জানাল, প্রতিদিন মঠের সান্ধ্য উপাসনায় যায়। যেহেতু এই উইক এন্ডে আমি এখানে, তাই যাবে না। কোয়ার্টারের বারান্দায় বসে দূরে ধোঁয়াটে শুশুনিয়া পাহাড়ের দিকে চেয়ে চায়ে চুমুক। বাতাসে ছোটবেলার হারানো সোঁদা গন্ধটা ফিরে পাচ্ছি। যেমন লালমাটি ভেজা শালফুলের গন্ধমাখা বর্ষা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য উধাও। অন্ধকার ঘনীভূত হতে দেখা দিল অ্যাম্যাঞ্জির সেই চাঁদ। এবার অন্য রূপে মায়াময়। দূরে কিছু লোকের আবছায়া সিল্যুয়েট। চাঁদের কুচি গায়ে মেখে শুশুনিয়া পাহাড়।

মা ঘরে। বোধহয় রাতের খাবারের আয়োজন শেষ করে বসবে। পুরনো ব্যথাটা আবার মুচড়ে উঠছে। কীসের ঠিক জানি না। আর্কাইভে ফেলা রামগোপাল বা সৌরিকের প্রাক্তন আঘাতের জন্য ঠিক নয়। আরও গোপনে সিন্দুকে রাখা অন্য অজানা অনুভূতি।

কীসের ব্যথা?

সাফল্য, ব্যর্থতা, একাকীত্ব?

নাকি, মিঠে ব্যথার হাত ধরে বর্তমানের একাকীত্বে নিজেকে নতুন করে পাওয়া। ছোটবেলার দাদুর মুখটা ভেসে উঠল। দাদুর পাশে খাটের ওপর পা দুলিয়ে তক্তি-নাড়ু খাওয়া। দাদুরই মুখে বহুদিন আগে শোনা শ্লোকঃ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।।।

চোখ বুজলাম। অনুভব করছি নিজেকে। শূন্যতার মধ্যে কোথায় পূর্ণতার স্বাদ। নিজের মনেই গেয়ে উঠলামঃ

আমার জ্বলেনি আলো অন্ধকারে
দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে।।
তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে
কঠিন দুখে গভীর সুখে-
যে জানে না পথ কাঁদাও তারে।।

চেয়ে রই রাতের আকাশ পানে,
মন যে কী চায় তা মনই জানে।।

গানে বিভোর লক্ষ করিনি মা কখন পাশে এসে বসেছে। জানতে চাইল, আগে ভালো গাওয়া সত্ত্বেও গান কেন ছেড়ে দিলাম? গান আর নাচ দুটোই এক সময়ে প্রিয় ছিল। তবে নাচের প্রতি ছিল বেশি আগ্রহ। দুটোর টানাহেঁচড়ায় যাতে নাচটা নষ্ট না হয়ে যায়, তাই গানটাকে শখের আঙিনায় রেখে, নাচটাকে নিয়েই বহির্বিশ্বে প্রকাশের চেষ্টা। যদিও মাঝেমধ্যে একলা রাতে নিজের মনেই মনের আনন্দে গেয়ে উঠতাম।

অনেকক্ষণ নীরবতার পর মা জানাল বাকি জীবনটা সে এখানেই কাটাতে চায়। আমি বিয়ে করে সংসারী হলে খুশি হত। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও যখন ঠিক করতে পারিনি, আমার বিচারবুদ্ধির ওপর সব কিছু ছেড়ে দিয়েছে। মা যেন এখানেই তাঁর শান্তির মন্ত্র খুঁজে পেয়েছে।

যার যেখানে শান্তি।

আমার কী কিছু বলার থাকতে পারে?

আরও জানাল, এখানে একটা ছোট্ট দু-কামরার বাড়ি কিনতে চায়। যদি আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারি।

উত্তরের প্রতীক্ষায়...

ঘুম না আসা পর্যন্ত ভাবলাম। কাল মাকে নিয়ে শুশুনিয়া পাহাড়ের দিকে যাওয়ার ইচ্ছে। তাই জন্যেই তো গাড়ি ড্রাইভ করে আসা। ভাবার তাড়া নেই। অফুরন্ত সময়। বুঝতে অসুবিধা হল না, বোধহয় ফেরার আগে মনে মনে উত্তরের আশা করছে।

অমরকানন রনবহাল রোড ধরে শময়িতা মঠ থেকে শুশুনিয়া পাহাড় এক ঘণ্টার ড্রাইভ। পথটা ছাতনা গ্রামের কাছে দু-ভাগে বিভক্ত। পাহাড়ের দিকের রাস্তার দুপাশে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের সমারোহ। তার ফাঁক দিয়ে রাস্তাটা উঠে গেছে ইউক্যালিপ্টাস গাছের মধ্যে। পাতার ফাঁকে সকালের সূর্য লুকোচুরি খেলে যাচ্ছে। গাড়ি থামিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে অনায়াসে সময় কেটে মনটা জুড়িয়ে যেতে পারে। দূরের পাহাড়টা এখন অনেক কাছে। এই সবুজের ওপর কিছু গ্রামবাসীর অবাধ বিচরণ যেন পটে আঁকা গ্রাম বাংলার ছবি। পথে মুরগির লড়াইও চোখে পড়ল।

পাহাড়টি বাঁকুড়া উপত্যাকা থেকে উত্তর-পূর্ব বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর রাঢ় পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম দিকে ছোটনাগপুর উপত্যকা পাহাড়ি হলেও ক্রমশ পূর্ব দিকে নেমে গেছে সমভূমিতে। ওদিকটায় ঝোপঝাড় আর শাল গাছের জঙ্গল। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ফসিল সাইট হিসেবে পরিচিত। ওদেরই কাছ থেকে জানতে পারলাম এক সময় সিংহ, জিরাফ, হায়নার ফসিল পাওয়ার কথা। কাছে যেতে চোখ পড়ল একশিলা পাথরে খোদাই নরসিংহ পাথর। শুশুনিয়া ঝর্নাধারার উৎসে। এখান থেকেই ১৫০০ ফিট নরসিংহ পাহাড়ে আরোহণ। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালতে চোখ পড়ল ইউক্যালিপটাস গাছের ফাঁকে শান্ত হাতি পাহাড়ের দিকে। দূরে গন্ধেশ্বরী নদী। ধারা থেকে ঝর্নাটা আরও বেশি মনোরম।

যদিও নরসিংহ পাহাড়ে আরোহণের পরিকল্পনা আজকে নেই। তবুও বেশ বুঝতে পারছি এই পরিবেশে হঠাৎ চলে আসাটা আমার মানসিক আরোহণের যাত্রাপথ। অ্যাম্যাঞ্জিতে অবরোহণের মধ্যে অবচেতন থেকে চৈতন্যে যে আরোহণ শুরু হয়েছে, শুশুনিয়া বুঝি সেই আরোহণের সিংদ্বার।

এবার আরেক দেখা।

প্রকৃতির মধ্যে।

একাকী, অন্যভাবে।

খোদাইয়ের জন্য শুশুনিয়া গ্রামটির পাথর এক সময় প্রসিদ্ধ ছিল। কথায় আছে রাজা চন্দ্রবর্মণ চতুর্থ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি দুর্গ গড়েছিলেন। জায়গাটির নাম ছিল পুষ্করণা। চন্দ্রবর্মণ রাজত্বের রাজধানী। এখন পখন্যা নামে পরিচিত। ওখানে একটা পাহাড়ের টিলাতে লেখা 'ছক্রস্বামীর (রক্ষাগুরু বিষ্ণু) শিষ্য পুষককর্ণের রাজা সিংহবর্মণ, রাজা চন্দ্রবর্মণ ধোসো গ্রামের রাজস্ব বিষ্ণুবন্দনায় অর্পণ করল' পাথর-খোদাই চক্রের নীচে আরেকটি লাইন শঙ্খলিপিতে লেখা। আমার বোঝার বাইরে। শুশুনিয়া পরিচিত তার পবিত্র ঝর্না, ফুলের সমারোহ ও পর্বত আরোহণের জন্য। কিছু কিছু আয়ুর্বেদিক গাছও এখানে পাওয়া যায়।

ওখান থেকে ড্রাইভ করে বোদাই নদীর ধারে হাদল-নারায়ণপুর গ্রামদ্বয়ে। ওখানের মণ্ডল পরিবারের বড়তরফ, মেজতরফ ও ছোটতরফ টেরাকোটা মন্দিরের খোদাই প্রসিদ্ধ। বড়তরফ মন্দিরের প্রবেশর মুখেই রসমঞ্চ। মেজ ও ছোট তরফ মন্দির দুটোতেই আকর্ষণীয় টেরাকোটার কাজ, বিশেষ করে বিষ্ণুর অনন্ত শয়ান অবস্থা।

ঢোকরার কিছু মূর্তি কিনতে নেতকমলা আর বিন্ধজামে যেতেই হল। ফিরতে ফিরতে বিকেল।

সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে স্নান সেরে বারান্দায়। চায়ের কাপ হাতে দূরের শুশুনিয়া পাহাড়ের সূর্যাস্তের দিকে চেয়েছিলাম। চূড়াটা পড়ন্ত সূর্যের আস্তিন ছেড়ে অন্ধকারের আস্তিনে। দিনের বেলায় পাহাড়ের শৃঙ্গমালার দিকে তাকিয়ে যে অনুভূতি জেগেছিল, তা আরও প্রকট। যেন ধ্যানমগ্ন দেবাদিদেব মহাদেব। ধ্যানমগ্ন হয়ত নয়। ধ্যানের ভান করে চোখ বুজে মিটমিট করে হাসছে। নিজেই যেন মজা পাচ্ছে নিজের সৃষ্টির খেলায়। পর্বতশৃঙ্গ ধাপে ধাপে উঠে গেছে অন্ধকারের আস্তিনের ঊর্ধ্বে। মনটা উদাস বাউলের মতো একতারা বাজিয়ে গেয়ে উঠল, আয় আয় খেলবি আমার কোলে।

এই উইক এন্ড ছাড়া সে ডাক শোনার সময় কোথায়? ভাগ্যিস। নইলে কী যে হত? মায়ের মতো, কলকাতার ডামাডোল ছেড়েছুড়ে এখানেই পড়ে থাকতাম।

মা চুপচাপ পাশে বসে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম দু-কামরার বাড়ি কিনতে হলে লাখ পাঁচেক লাগবে। ধার-দেনা করতে হবে না। মায়ের যখন এত ইচ্ছে, সম্মতি দিলাম। লক্ষ করলাম মায়ের মুখটা সূর্যাস্তের মতো আলোকিত। জীবনের সায়াহ্নে এটুকু পাওয়াতেই শান্তি।

আরও অনেক কথা বলতে বলতে বুঝলাম, মা আমাকে সংসারী দেখতে আগ্রহী। এতদিন যখন সে পথে পা বাড়াইনি, ওপথে যাব কি না, সেই নেই মন দোলাচলে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে বেড়ানোর স্বাদটা উপভোগ করার সঙ্গে বারবার মনে হচ্ছে, এ সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে জোটে? তিরিশের নীচে যতটা কম ভাবার অবকাশ, পঁয়ত্রিশে এসে ভাবনার দরজাগুলো অনেক বেশি খুলে গেছে। অ্যাম্যাঞ্জিতে অবরোহণের পর আরও বেশি করে। অচৈতন্য থেকে চেনার বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে দর্শন না করে, সে পথে এগোনোর কোনও মানেই হয় না।

এও বুঝলাম, শান্তিটা টাকার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা যায় না। সাংসারিক বলয়ের লক্ষ্মণরেখার মধ্যে স্থায়িত্ব দিয়ে তো নয়-ই। কোনও দিন যে করার চেষ্টা করেছি, এমন নয়। এখন তো আরও-ই

নয়।

ওটা অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে।

পূর্ণতার ঘড়া ভরার আগেই যেন তার দিকের হদিস পাচ্ছি। ধ্রুবতারাটা অজান্তে ক্রমশ ধীরে ধীরে আকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে সন্ধ্যালোকে। এখন শুধু তার নিশানা ধরে এগিয়ে যাওয়া আরোহণের সোপানে।

দেখার চোখ থাকলেই তো চেনা যাবে তাকে। এবার তাই দেখার পালা।

একাকী, অন্যভাবে।

তিন

কলকাতা থেকে দূরে শময়িতাতে তো মায়ের শান্তির ঠিকানা দেখা হল। এবার নিজের দেখার পালা।

থাকব না এ বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে

ইচ্ছে থাকলেও চাকরির বন্ধনে ছুটি পাওয়া মুস্কিল। তাই ঘরে বসেই পাখনা মেলে স্বপ্নের ময়ূর মহলে ভাসা। বলাকাদের পাখায় পাখায়। দূর থেকে দূরান্তে। বেদুইনদের স্বপ্নপুরীর জলসাঘরে। যেখানে বেজে চলে আনন্দের প্লাবন থেকে ব্যথার সন্ধ্যারতির একটাই রাগ।

সামিল হতে ওখানের সিম্ফনিতে।

একাকী, অন্যভাবে।

মৌনিস বোধহয় আমার বেদুইন মনটার আঁচ পাচ্ছিল। তাই সাংসারিক বন্ধনের কথা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে আমাকে আমার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে ক্ষণিকের জন্য নিষ্কৃতি দিল। দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা মাস পার হয়ে গেল। ভেতরে ভেতরে উড়ু উড়ু মন। শুধু ছুটির অপেক্ষায়... অবশেষে একদিন র‍্যাক্স্যাক নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম।

গঙ্গার উৎসে, গোমুখে।

গঙ্গোত্রীর মন্দিরটা দূর থেকে সাদা ঝকঝকে। চারপাশের পাহাড়গুলো ঠিক যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মন্দিরটাকে কোলে টেনে নেবে বলে। দুরন্ত গতিতে বয়ে চলা কিশোরী গঙ্গা। গান গেয়ে লাফিয়ে দৌড়চ্ছে পাহাড়গুলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে। আমি আকাশের দিকে চেয়ে। অদ্ভুত নীল। মাঝেমাঝে এক চিলতে মেঘ। ঝকঝকে, জ্বলছে সুদর্শনের চূড়ায় বরফের মুকুট। সামনের রাস্তাটা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের ফাঁকে লুকিয়েছে। ওই রাস্তা ধরেই যেতে হবে গোমুখ। যেখানে সুরধুনী গঙ্গার শুরু।

পুলওভারের হাতা সরিয়ে সময় দেখলাম। ছ'টা এখনও বাজেনি। হাড় জমানো ঠান্ডা। মাংকি টুপিটা ভালোভাবে এঁটে নিলাম। মাফলারটা গুছিয়ে গলায় জড়ালাম। ঠান্ডাটা আষ্টেপৃষ্ঠে ছেঁকে ধরেছে। রাস্তা খতরনক বলে গাইড রঘুবীর সিং ডাকছে। কাঁধে র‍্যাক্স্যাক তুলে পা বাড়ালাম।

বিপজ্জনক রাস্তায় চলার মাদকতাই আলাদা। সামনে কী, জানি না। দরকারও নেই। শুধু হেঁটে চলা। মাঝে চড়াই-উতরাই তো থাকবেই। গন্তব্য একটাই। ফাইন্যালি টু দ্য গ্রেভ। চলার মধ্যে যতটা সার্থকতা আছে, গন্তব্যে পৌঁছনোর মধ্যে অতটা নেই।

তারপর কী?

জানি না।

চলার ছন্দটা বর্তমান। তাকে অনুভবেই মাধুর্য। প্রবাহমান পৃথিবীর নিয়মে সকলকেই একদিন চলে যেতে হয়। কে রেখে গেল, কে বিলীন হয়ে গেল, কী আসে যায়? জীবিতকে নিয়ে মাতামাতি পৌঁছবে না মৃতের কাছে। হাততালি বা কর্ম, অর্থহীন। যদি না জন্মান্তরবাদ সত্যি হয়।

গঙ্গার পাড় দিয়ে রাস্তা। প্রথমটা ভালোই। সাধারণ পাহাড়ি রাস্তার মতো। বাঁ দিকে বিশাল পাহাড় সোজা উঠে গেছে আকাশের দিকে। পাহাড়ের গা বেয়ে ঘন জঙ্গল। নাম না জানা গাছের দল পাহাড়টাকে সবুজ আস্তরণে ঢেকে রেখেছে। ঝিঁঝিঁরা কনসার্টে সরব। প্রকৃতির গান। রয়্যাল ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রাও এদের ছন্দ স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনত। সিমফনির জন্য মিউজিক্যাল স্কোর লেখার প্রয়োজন নেই।

সুর না থাকলেও সুর।

গান না থাকলেও গান।

স্বরলিপি থেকে একটুও কম নয়।

আপনভোলা ঝংকারে গাইছে হৃদয়ের গান।

ডানদিকে গভীর খাদ। অন্তত হাজার দেড়েক ফুট। অনেক নীচে বড় বড় বোল্ডার। তার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে গঙ্গার নীলচে সাদা জল। সামনে তাকালে সবুজ পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে মাঝেমাঝে ঝকঝকে সাদা বরফের মুকুট পরা শৃঙ্গ। যেন প্রকৃতি সাদা আস্তিন ছড়িয়ে শান্তির বন্দনা গাইছে।

কবে তুমি আসবে?

কবে নিশ্চিন্ত আলস্যে ঠাই নেবে আমার কোলে?

তোমার প্রতীক্ষায় আছি। শোনাতে তোমাকে ছেলেবেলার ঘুম-পাড়ানি গানঃ

খোকা ঘুমল পাড়া জুড়ল বর্গী এল দেশে,

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে।

রঘুবীর সিংকে গাইড নেওয়ায় প্রথমে একটু কিন্তু ছিল। অনেকেই বলছিল গাইড লাগে না। আমি নভিস। এ অঞ্চল অচেনা। হিমালয়ের এই সহজ সরল লোকগুলোকে ভালোই চিনি। পার্থিব ধনের বাইরে এরা মনের দিক দিয়ে পরম ধনী। লাগুক চাই না-লাগুক, গাইডের নাম করে যদি এদের কিছু সাহায্য করা যায় আমারই ভালো লাগবে।

নামেই রাস্তা। আসলে একটা ঘোড়া চলার মতো ট্র্যাক। কখনও ভালো, কখনও খারাপ। মাঝে মাঝে তা-ও হারিয়ে যাচ্ছে। কোথাও অজস্র নুড়ি-পাথর রাস্তার ওপর। পা হড়কে যায়। অন্তবিহীন চড়াই-উতরাই।

এক জায়গায় এসে রঘুবীর জানাল দাঁড়াতে হবে। তাকিয়ে দেখলাম একটা পাহাড়ি ঝর্না। বাঁ দিক থেকে নেমে নাচতে নাচতে রাস্তার ওপর দিয়ে ডানদিকের খাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওপরে একটা গাছের গুঁড়ি আড়াআড়ি ফেলা। তার ওপর দিয়েই পেরতে হবে। জলের তোড়। গুঁড়িটাও ভীষণ পেছল। সাবধানে পা ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলে ঝপাস্। একদম জলের মধ্যে। লাফিয়ে এসে রঘুবীর না ধরলে সোজা নীচে।

জিনসটা পুরো ভিজে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসলাম। ভীষণ ঠান্ডা লাগছে। চেঞ্জ করতে গেলে র‍্যাকস্যাক খুলতে হবে। ভাবতেই কান্না পেল। জুতো জোড়াও ভিজে চপচপ। মোজাটা

চেঞ্জ না করলেই নয়। ঠান্ডা লেগে জ্বর বাঁধিয়ে ফেলতে পারি। রঘুবীর বুঝতে পারছিল। জানাল, কিছুক্ষণের মধ্যেই চিরবাসা। ওখানে দোকানে চেঞ্জ করা যাবে।

এবার আর নিজের উপর ভরসা না রেখে রঘুবীরের হাত ধরেই ঝোরাটা পেরলাম। চিরবাসা মানে প্রায় অর্ধেক পথ। কয়েকটা ছোট দোকান। কয়েকজন দোকানদার, দু-চারটে ভৃগুপন্থ ঘোড়া। এই নিয়ে বেসিনের মতো চিরবাসা। চারধারে আকাশচুম্বী পর্বতশৃঙ্গ। ভৃগুপন্থ, সুমেরু, শিবলিঙ্গ - কত নাম। জানা-অজানা অখ্যাত বিখ্যাত শিখর যুগযুগান্ত ধরে দাঁড়িয়ে। শুধুমাত্র গঙ্গার গর্জন ছাড়া, জায়গাটা নিস্তব্ধ। সেই নৈঃশব্দ্যের অতন্দ্র প্রহরী পাহাড়গুলো।

হঠাৎ কিছু বাঙালি স্বর শুনে ফিরে তাকালাম। আমায় উদ্দেশ করেই প্রশ্ন করছে, ভিজলাম কী করে। চার জনের বাঙালি দল। গোমুখ দেখে রাতে ভুজবাসায় ছিল। আজ নামছে। কী করে বুঝল আমি বাঙালি? প্রশ্ন করতেই ওরা হেসে বলে উঠল। আমি না কি জগদীশচন্দ্রের কথা আওড়াচ্ছিলাম নদী তুমি কোথা হতে আসিয়াছ? খেয়ালই করিনি চলতে চলতে নিজের মনে কী বিড়বিড় করছিলাম। স্লিপ করে পড়ে যাওয়ার কথা ওদের জানাতে, ওরা যেতে যেতে জানাল, সামনে রাস্তা খুব খারাপ।

র‍্যাক্স্যাক থেকে জিনস মোজা চেঞ্জ করলাম। একা থাকি বলে চিন্তাটা বেশি। জ্বর হলে তো কেউ দেখার নেই। মৌনিস ফোনে খোঁজ নিতে পারে। কয়েকবার দেখতে আসতেও পারে। এসবের বাইরে আমি তো একলা। রঘুবীর ততক্ষণে দু-গ্লাস চা নিয়ে এসেছে। হিমালয়ে গরম চায়ের চেয়ে কাম্য বস্তু আর কিছু নেই। চা খেয়ে আবার চলা। দু-পাশের সিন-সিনারি ঠিক এ পৃথিবীর মনে হচ্ছে না। এ যেন মায়াপুরীতে এসে পড়েছি। এই অখণ্ড বিস্তারের মধ্যেই জীবনের স্বাদ। যা আমাকে জাগাতে পারে ক্ষণভঙ্গুর তাসের দুনিয়ার ওপরে। বাঁচিয়ে রাখতে পারে আমার ভেতরের মানুষটাকে। এই ঘ্রাণ, আমার প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখবে চিরকাল। সীমার মধ্যে থেকেও হয়ত পেতে পারি অসীমের স্বাদ।

কম কী? যদি না...

রঘুবীর জানাল আগে গিলা পাহাড়। সব সময়েই নাকি ওখানে পাথর পড়ে। সাবধানে এগোতে হবে। আর কিছুটা এগোতেই গিলা পাহাড়। রঘুবীর দেখাতেই চোখটা ওঁর হাতের দিকে ঘুরে গেল।

এক বিচিত্র দৃশ্য। অনেকদিন আগে দেখা ম্যাকেনাজ গোল্ড ছবির কথা মনে পড়ল। অগুনতি বিশাল থামের মতো পাহাড় দাঁড়িয়ে। দেখে মনে হচ্ছে যেন মাটির থামের গায় বড় বড় পাথর আটকে দিয়েছে কেউ। একটু হাওয়া দিলেই মনে হচ্ছে থামগুলো দুলছে। মাঝেমাঝেই ছোট বড় পাথরের টুকরো গড়িয়ে পড়ছে। দেখলেই ভয় লাগে।

রঘুবীর আমার কাছ থেকে র‍্যাক্স্যাকটা নিজের কাঁধে নিলো। গিলা পাহাড়ের নীচে দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে পেরিয়ে গেলাম। মাঝেমাঝেই ছোট ছোট নুড়ি পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ছে। যদি কারও গায়ে বড় একটা পড়ে, নির্ঘাত মৃত্যু। এক কিলোমিটার পথ কীভাবে যে পার হলাম জানি না। ওসব মাথায় নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুজবাসা। রঘুবীরের কথায় সামনে তাকিয়ে দেখি দূরে ছোট ছোট কতগুলো ঘর। নীচে ভ্যালির মধ্যে। ডানদিকে অনেকগুলো পিকের মধ্যে চোখে পড়ছে শিবলিঙ্গ। খাড়া উঠে গেছে। মাথাটা দেখলে মনে হয় যেন আলাদা টুপি পরা। সামনে দিয়ে একটা গিরিশিরা নেমে এসেছে ঠিক হাতির শুঁড়ের মতো। অনেকে একে গণেশজিও বলে। সোজা সামনে সম্রাটের মতো দাঁড়িয়ে ভাগীরথী পর্বত। সকালের রোদে তিনটি পিক-ই ঝকঝক করছে। যেন মুঠো মুঠো সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে শৃঙ্গে।

রঙের হোলি খেলছে সূর্যিমামা। যেন শ্বেতবসনা বিধবাকে রাঙিয়ে দিচ্ছে রঙিন আবিরে। সিঁদুরের মুঠো দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছে তার প্রশস্ত ললাট। ভাতিয়ারে ছেয়ে ঘুমভাঙানিয়া গান। আজকে দোল পূর্ণিমা নয়, দোল মহাজয়ন্তী।

রঘুবীর বলল, সামনে গোমুখ। ভাগীরথীর নীচে। প্রায় চার কিলোমিটার দূর থেকে ছোট্ট কালো একটা বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। ইম্প্রেসিভ লাগল না। ওটাই গোমুখ! আমার গলায় হতাশা। এত শুনেছি এর সম্বন্ধে। আসলে এই। রঘুবীর অবাক। আমার দিকে তাকাল। ঠিক বুঝতে পারছে না আমাকে। কলকাতা থেকে কাতারে কাতারে বাবুরা বউ-বাচ্চাও নিয়ে আসে। এখানে এসে আনন্দে নাচানাচি। আমি যেন অন্যদের থেকে আলাদা। রঘুবীর আমার মনের ভাবটা বুঝে জানাল, কাছে গেলে আরও ভালো দেখা যাবে।

দু-জনে ভুজবাসার লালবাবা আশ্রমের পাশ দিয়ে এগিয়ে চললাম গোমুখের দিকে। কিছুটা যেতেই রাস্তাটা বেপাত্তা। শুধু বড় বড় পাথর। ছোট বড় বোল্ডার। পা ফেলতে গেলেই পাথর নড়ে উঠছে। আমার কিছুটা শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। অল্টিচুড ১৩০০০ ফুটেরও বেশি। হাঁটতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। হাতের লাঠিটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। রঘুবীর উৎসাহ দিয়ে দেখাল সামনে গোমুখ।

একটা বোল্ডার পেরোতেই চোখের সামনে হঠাৎ স্বর্গ যেন দরজা খুলে ধরল। মনে হল স্বপ্ন দেখছি। ঝকঝকে ভাগীরথীর শৃঙ্গ থেকে নেমে এসেছে একটি নদী। জলের নয়, বরফের। নীলচে বরফ। সেই নদীতে বড় বড় বরফের চাঙড় ভাসছে। নদীটা নীচে এসে হঠাৎ ভেঙে পড়েছে এক বিশাল গুহায়। আলো সেই বিশাল গুহার ভেতরে বেশি দূর ঢুকতে পারেনি। অন্ধকারের ভেতর থেকে কলকল করে বেরিয়ে আসছে আলোর ধারা। না, আলো নয়, ঝলমলে জল।

এই গোমুখ!

বুঝতে পারিনি, কখন আমার দু-চোখ বেয়ে নেমে এসেছে আরেক নদী। ভাসিয়ে দিচ্ছে সমস্ত শরীরকে। সব কষ্টের সার্থক গন্তব্য। কিছুক্ষণ আগেই ভাবছিলাম গন্তব্যে পৌঁছনোর সার্থকতা। এখন বুঝতে পারছি, হয়ত ঠিক বুঝিনি। বাইরের গন্তব্যটা আসীম। এই অসীমকে পাওয়ার সার্থকতা অপূর্ণ থেকে যেত, যদি না এই মুহূর্তে গোমুখে দাঁড়িয়ে থাকতাম। গলার মধ্যে এক অসহ্য ব্যথার দলা। বুকের মধ্যে এক অসহ্য আনন্দের সাগর আছড়ে পড়ছে -

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর

এই গোমুখ!!

আমার মুখ দিয়ে অস্ফুট আবেগে বেরিয়ে এল, বহু শোনা, বহু ব্যবহারে ক্লিশে এক প্রাচীন অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর অন্তরের কান্না মেশানো ভক্তির অর্ঘ্যঃ

দেবি সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে
ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে।
শঙ্কর-মৌলি বিহারিণী বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে

এই চেতনার মধ্যে আবিষ্কার করলাম আরেক অজানা, অচেনা পৃথিবীকে। মনের বাইরে সুপ্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে। কোথায় যেন সেই ব্রহ্মাণ্ড বারবার হাতছানি দিচ্ছে। এই ব্রহ্মাণ্ড একমেবাদ্বিতীয়ম। জাগতিক হানাহানি কলুষের বাইরে তো এখানেই পূর্ণতা।

কে বুঝল, না বুঝল, কী আসে যায়?

এই না-বোঝা, না-চেনা পৃথিবীটাকে নিজের করে পাওয়ার মধ্যেই সার্থকতা।

চার

প্রেম কী, জানি না। কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকিয়ে পাশাপাশি বসে থাকা একটা মুহূর্ত? আমার মধ্যে কবিতার প্রেমের ছন্দ নেই। ছন্দ ও সুর বারবার একটা তার ছেঁড়া রাগে গিয়ে মেশে...

তাই বড্ড ভয় হয়।

নিজেকে...

কাছ থেকে...

একাকী।

পাছে উল্টো ফাঁদে পা দিয়ে না ফেলি।

চাঁদের মিঠে আলোটাকেও তো একা অনুভব করা যায়। চাঁদ দেখতে গেলে কি প্রেম করতে হবে? প্রকৃতি আমার অনন্ত সাথী। না-কেনা ব্যথার মলম। অনুভব একান্ত নিজস্ব। নীরবে একাকী। না-ছোঁয়া প্রেমের কাব্য লেখা। তাই ধ্রুবতারার খোঁজে অ্যাম্যাজ্ঞি থেকে গোমুখ।

মরীচিকা?

না,অদেখাকে কাছে পাওয়ার নতুন সোপান?

চাঁদকে বোঝবার রেশটুকু সৌরিকের হাত ধরে অনুভব করতে চেয়েছিলাম। ওকে চাঁদের আলোয় দেখা, সে তো অনেক দূরের। তবুও তার মধ্যেই খুঁজতে চেয়েছিলাম গতানুগতিক সুখ-দুঃখের উপাখ্যান। বেঁচে থাকার নব কলতান। ওর হাত ধরে গাইতে চেয়েছিলাম জীবনের ঐকতান। দুজনে, পাশাপাশি। রঙিন পরীদের স্বপ্ন আবেশে। জাগতিক তাসের দেশের চির পরিচিত অঙ্কে। রয়ে গেছে তারই কিছু স্মৃতি। এখন ক্রমশ বিস্মৃতির অতলে। বিস্মৃত স্মৃতিকে দূরে সরিয়ে মন খুঁজছে আমার অন্তরের সত্ত্বা। অর্থহীন জীবন যাপনের ঘেরাটোপে। তাই মৌনিস কাছে আসতে চাইলেও, আজও দূরে।

জাগতিক সীমা, বৃহত্তর অসীমের দোলাচলে।

একাকী ধ্রুবতারা খোঁজা অন্তরের গভীর অতলে।

আমি, আর আমার বেঁচে থাকার মধ্যে, কত-ই তফাত!

এই দোলাচলের ক্ষীণ সুতোয় দাঁড়িয়ে আমার অস্তিত্বকে দেখা, বিশ্লেষণ করা, এগিয়ে যাওয়া। সেখানে এই মৌনিস থাকবে, না অন্য কোনও মৌনিস আসবে, সেটা পরের কথা। এখন শুধু নিজেকে চেনা। আমার মতো করে।

মা তো তবু শান্তির একটা হদিস পেয়েছে। আমার তো এখনও বাকি। সেটা জল, স্থল, অন্তরীক্ষের বাইরে কোনও অজানা ভূমণ্ডলে হতে পারে। অন্য কোনও ইউনিভার্সে। কিংবা চেতনাটা সেই মহাব্যোমে ব্ল্যাক হোলের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে ফুটে উঠতে পারে কোনও নতুন রূপে।

সেটাই আসল আমি।

বাকি সব শুধু বর্তমান জাগতিক আবরণের খোলস মাত্র। সেখানে সামনে দাঁড়ানো প্রেম, মৌনিসদের অস্তিত্ব, না-ও থাকতে পারে। না জেনে-বুঝে, না চিনে, দুম করে ঝাঁপ দেওয়া বোকামি। অর্থহীন।

সীতার মতো লক্ষ্মণরেখা থেকে বিচ্যুত মহাশূন্যে ভাসছি। রাম-রাবণের বিশ্লেষণে, কাজ কী?

সামাজিক সন্দেশের ছাপের খোলসটা অ্যাম্যাঞ্জিতে খসে পড়ে গেছে। এখন সেই মধ্যাকর্ষণ থেকে বিচ্যুত আমি, শূন্যতার পূর্ণতা আনতে চড়ে বসেছি কণ্টকাকীর্ণ অষ্টমাঙ্গিক মার্গের উন্মীলিত চেতনার পুষ্পকরথে। চেতনায় আলোকিত হয়ে নিজের পূর্ণতায় ধৌত হতে দর্শন থেকে মহানৈসর্গিক প্রেমে। সেই প্রেমের কবিতাই তো খুঁজছি অনির্দিষ্ট যাত্রাপথে। মনের সুপ্ত অনুভূতিকে নিজস্ব উপলব্ধির ভাষা দিতে নতুন কাব্যিক ছন্দে। ডুবে যাওয়া চাঁদটাকে সরিয়ে অন্য সূর্যের নতুন প্রভাতে।

জিরো পয়েন্ট থেকে দুই কিমি দূরে। কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের টুরিস্ট লজে। বিনসরের এই বিচ্ছিন্ন নিরিবিলি রিসর্টটা সভ্যতা থেকে অনেক দূরে। দিনে দু-ঘণ্টা সোলার আলো, তারপর ইলেক্ট্রিসিটি শূন্য। দোকানপাট থেকে অনেক অনেক দূর, প্রকৃতির কোলে। গভীর অভয়ারণ্যে শান্ত, নির্মল প্রকৃতির কোলে নৈসর্গিক ডালি সাজিয়ে। ঘরের বাইরে বিশাল টেরেসে বসে দূরে হিমালয়ের শৃঙ্গমালার মনোরম দৃশ্য মনকে উদাস করে। নিয়ে যায় মায়ালোকে। উন্মুক্ত আকাশ। সারি সারি পাহাড়।

কী বলব? সুন্দর? ভয়ঙ্কর? নাকি, ভয়ঙ্কর সুন্দর?

হিমালয়ের দিকে তাকাতেই এক অদ্ভুত তৃপ্তি আমায় গ্রাস করছে। দেবাদিদেব মহাদেব। ধ্যানমগ্ন বটেই, তবে আমার মনে হল ধ্যানমগ্ন নয়। ধ্যানের ভান করে, চোখ বুজে মিটিমিটি হাসছে মহাদেব! নিজের সৃষ্টির খেলায়, নিজেই মজা পাচ্ছে। পাহাড় ধীরে ধীরে উঠে গেছে মেঘালোক ছাড়িয়ে স্বর্গলোকে। নিঃশব্দে ডাকছে আমাকে নিজের কোলে। সে ডাক সবাই শুনতে পায় না। ভাগ্যিস! পেলে যে কী হত? সব ছেড়েছুড়ে সংসারের মায়া কাটিয়ে, সবাই দৌড়ত পাহাড়ের কোলে।

হিমালয়ের এই বিশালতার কাছে নিজেকে কত ক্ষুদ্র মনে হল। প্রাণ ভরে শ্বাস নিলাম বিপুলতার দিকে চেয়ে। এখানে যেন জীবনের অন্য ঘ্রাণ। কংক্রিটের জঙ্গল থেকে অনেক আলাদা। মানুষের কোলাহলের বাইরে।

ঘুরতে গিয়ে সবাই হইহই করে ছোটে দ্রষ্টব্য দেখতে। ক'জনেরই বা সময় আছে থমকে দেখার? দূরের পাইন গাছগুলো হাত দুলিয়ে বলছে, এত তাড়া কীসের? একটু থেমে যাও না। দেখ না, আমরা কেমন স্তব্ধতার মৌন মিছিল করে তাঁর পুজো করছি। মনে হল শতাব্দী প্রাচীন মহাদ্রুমদল সত্যিই ধ্যানমগ্ন। লজের চারদিকের গাছে ফাঙ্গাসের চাদর। চারপাশে বুনো অর্কিড ফুলের মাতাল করা বুনো গন্ধ। পাইনের পাতায় কুয়াশার জমে থাকা জল টুপ টুপ করে পড়ছে। এক অবিস্মরণীয় জলতরঙ্গ। মহাকাল যেন শোনাচ্ছে এক অপরিচিত রাগ। জঙ্গল ছাপিয়ে নীল আকাশে উঠে গেছে মেঘের ঢেউ। কোন স্বর্গপুরীর মায়াবী রাজ্যে।

গোধূলির রক্তরাগে শুনতে পাচ্ছি কুহকের মায়ডাক। ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছি তার মায়াজালে। সানসেট পয়েন্টে যাওয়ার দরকার নেই। অনুভূতিটাকে মনের ক্যামেরায় ধরতে পারলেই এখানে আসা সার্থক। রক্তিম গোলাকার সূর্যটা মন্থর গতিতে পাহাড়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ছে নীল আকাশে আবিরের আভায়।

গোধূলি সন্ধ্যায় মিশে যেতে থাম্বার আড়ালে একটা বেতের মোড়ার ওপর হ্যাজাকটা রেখে বেয়ারা চলে গেল। রেখে গেল বারান্দার কোণে আলো-আঁধারির লুকোচুরি। নিজেকে আবার ভাসিয়ে দিলাম শূন্যতার ভেলায়। হৃদয়ের স্পন্দন অন্য সুরে বেঁধে দিয়েছে মুহূর্তটাকে। ছন্দহীন এক অনাবিল আনন্দের জোয়ারে। ভাষা স্তব্ধ, স্বপ্ন মিছিলে হারিয়েছি একা। নেই কোনও সুর... তাল... ছন্দ... লয়।

শুধু পড়ে চেতনার বলয়। যেন অনন্ত মহাকালের ব্যাপ্তির বুকে আমি একা। মহাবিশ্বের নতুন পরিক্রমার দোরগোড়ায়। জানা অঙ্কের সমাধান চেনা ভূমণ্ডলের বাইরে। সীমিত চিন্তার বলিরেখা পার হয়ে ভাসছি অসীম মহাশূন্যে।

সেখানে আমি নেই...

সেখানে মৌনিস নেই...

ভালোবাসা নেই...

কাল নেই...

অতীত নেই...

ভবিষ্যৎ নেই।

বর্তমানটা শূন্যে, কালের কষ্টিপাথরে।

এই কী ভালোবাসা!

এই কী প্রেম!

হতে পারে এটাই প্রেমের পরিণতি।

হতে পারে ভালোবাসার সদ্‌গতি।

আমি যে মেতেছি ভালোবাসার গুঞ্জনে।

তারই পূর্বাভাস ঘরে ফেরা পাখিদের কুজনে।

দেহের উত্তাপকে সজাগ করতে সামনে রাখা কফির মগে একটা চুমুক। ভালোবাসার অন্তঃপুর শুধু স্রোতের তরঙ্গ নয়। কোনও এক বর্ণময় কাব্য। শকুন্তলা-দুষ্মন্ত, পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা, লায়লা-মজনু, কিংবা অন্য পুরনো কোনও পরিচিত গল্প।

হতেই পারে না, এই আমার স্বপ্নে দেখা স্বর্গ।

হতেই পারে না, এই ভালোবাসার বিন্দু বিসর্গ।

হতেই পারে না, এ কোনও মধুমাখা জ্যোৎস্না।

হতেই পারে না, কারও চোখে চোখ রাখা এই মৃগনয়না।

হতেই পারে না, সংসারের বালুচরের কোনও রেশ।

হতেই পারে না, দেখা, চেনা, জানা পুরনো স্বপ্নের

নতুন মোড়কে মোড়া এক-ই ছন্দের কাব্যভরা রেশ।

নন্দাদেবী, মৃগতুনি, মাইকটোলি ও ত্রিশূল পাহাড়ের সারিগুলো আবছায়ায় হারিয়ে যাচ্ছে, দিনান্তের শেষে হামাগুড়ি দেওয়া রাতের আঁচলে। যেন অস্তরাগের শেষ ঝালাটা নীরবে বাজিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের কোণে।

শুনতে পাচ্ছি, বনবীথিকার পটভূমিতে পাহাড়ের গুঞ্জন।

শুনতে পাচ্ছি, পাহাড়ে অন্তরের ভালোবাসার গান।

শুনতে পাচ্ছি, অন্ধকারের ধূসরে নবছন্দের ঐকতান।

স্নানের পর গরম কফির স্বাদটা বেশ আরামদায়ক। একাই বসে তাকিয়েছিলাম আঁধার নির্জনতার দিকে। সেখানে অনন্ত রাত্রি মহাসংগীত গাইছে। আমার প্রাণে তার-ই প্রতিধ্বনি।

কীসে আমার আনন্দ?

কীসে আমার মুক্তি?

কীসে আমার পরিতৃপ্তি?

মোবাইলটা হাতে নিয়ে একবার চোখ বোলালাম। কোনও সিগন্যল নেই! সভ্যতা থেকে নিমেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাচীনতাকে যেমন দেখা যায়, নিজেকেও হয়তো আরও বেশি কাছে পাওয়া যায়।

এই মুহূর্তে...

সেই নির্জনতার বড় প্রয়োজন আমার।

কোলাহল আলো মেশা অন্য কোনও রিসর্টে নয়।

সেখানে আড়ম্বরের রূপটুকুই শুধু কথা কয়।

ভালোবাসা?

তা-ও নয়।

এখন শুধু নিজেকে দেখা আমার মতো করে।

স্বপ্নের মায়া কাটিয়ে সত্যের নীরবতায়, অন্ধকারে।

প্রেমটা কী মুহূর্তের দোলা?

বৈচিত্র্যহীন নিত্যনৈমিত্তিক খেলা?

যদি তাই হয় সৌরিক, মৌনিস তো সেই মুহূর্তের শরিক। অনন্ত প্রেমের সীমাহীনতার বাইরে ওরা। আমি তো খুঁজছি যুগ-যুগান্তের প্রেমের ঠিকানা। কালের চৌহদ্দি পেরিয়ে শ্বাশ্বত সত্যের নিশানা। অবিচ্ছেদ্র যোগসূত্রটা, যেন আমার চিন্তার মায়াজালে একটা দোলাচল সৃষ্টি করেছে। সেই আবর্তে খুঁজছি নতুন কোনও দীপশিখা। বিজ্ঞানীরা বলে এন্ডরফিনস। আমি বলি, নব চেতনার নিশ্চিত নতুন খেলাঘর।

হ্যাজাকের আলো কী দেখাতে পারবে প্রেমের ধ্রুবতারাটাকে? অন্ধকারে নিস্তব্ধ অনুভবে। হয়তো অদেখা বহ্নিশিখা ঝিলিক দেবে আঁধারের আবছায়াতে। হ্যাজাকের মৃদু আলো-আঁধারিতে। থাম্বার ওপাশ থেকে হ্যাজাকের আবছা আলো আমার সিল্যুটকে ভাসিয়ে দিচ্ছে অন্ধকারের সুনামি স্রোতে। দেখতে গিয়েও যেন দেখা যাচ্ছে না। হ্যাজাকের শব্দ, নিঝুম রাতে একঘেয়ে আঁধারে বেজে চলেছে বিরামহীন না-চেনা ছন্দ রাগে।

হারিয়ে গেছি কোনও একান্ত জগতে।

মূল থেকে বিচ্ছিন্ন অজানা স্রোতে।

সেখানে আমি নেই, পড়ে শুধু আত্মবীক্ষা।

কী ফেলে এসেছি, কী পেতে চাইছি...

যুগলের মহা-সন্ধিক্ষণের আসল শিক্ষা।

বনলতা সেন শুধু মনের কল্পনাস্রোতে ভেসে থাকা মুহূর্ত মাত্র। তাই নিয়ে যত ছন্দ, কাব্য, রোমান্সের ইমেজারি যত্রতত্র। কতই না বিশ্লেষণ। বহু লোকের অধিবেশন। অতীতকে আঁকড়ে ধরে বর্তমানকে না-দেখার লুকোচুরি খেলা।

লক্ষ করছিলাম, ওই অন্ধকারের মধ্যে থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা হ্যাজাকের দিকে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসছে।

আলোর পিপাসায়...

পুরনো রীতির গতে বাঁধা নেশায়।

মরীচিকার পেছনে ছোটা জাগতিক আশায়।

হঠাৎ চোখে পড়ল অনেক পোকা আলোর উত্তাপে আছড়ে পড়ছে বেতের মোড়ার চারপাশে। ডানা ঝাপটাচ্ছে তবুও উড়তে পারছে না। আধমরা হয়ে ছটফট করছে বৃথা। মৃত্যু ঠাঁই দিচ্ছে না। উড়তেও দিচ্ছে না জীবন। মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে কাতরাচ্ছে ঝিঁ-ঝিঁ শব্দের ঘেরাটোপে। ঠিক যেন শহুরে গ্ল্যামার-সর্বস্ব জীবনে মরেও বেঁচে থাকা। লেপটে আছে দাওয়ার মাটিতে। ছটফট করছে, চেষ্টা করছে, তবুও পারছে না স্বভাবিক জীবনে ফিরতে। এর মধ্যে কোথা থেকে একটা ফিঙে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে উড়ন্ত গুটিকতক জীবন।

নির্জন পাহাড়ে ক্ষণজীবী পোকাগুলোর সঙ্গে এখনকার নগর জীবনের কী আশ্চর্য মিল! প্রকৃতি মানুষকে পোকার থেকে বেশি খুব কিছু দেয়নি। উত্তরণের তাগিদে মানুষ ছুটতে শুরু করে অবিকল পোকার নির্বুদ্ধিতায়। চেতনার অভাবে টের পায় না সীমা। নাকি, চেয়েও না-পাওয়ার অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা। ঠিক ওই পোকাগুলোর মতো। জীবনটাই আসলে আলোর নিশানায় ছুটে যাওয়া রীতির গতি।

আলো আঁধারের ঘূর্ণিপাকে স্বপ্নিল মায়া।
এড়ানো নিতান্তই কঠিনতার ছায়া।
অনেকে বেশি চালাক, কল্পনায় মসৃণ।
শ্রীর পরিবেশনে আসলে শ্রীহীন।
নানা রূপে, নানা সাজে, অচেনা আবরণে,
অগোচরে স্বপ্নের সহজ মায়াজালে চেতনাহীন।

সামনের পাহাড়গুলো মিশে গেছে অন্ধকারে। আলোর রোশনাইটাও সুদূর দিগন্তে বলিরেখার মতো আবছা। লক্ষ করছি ছটফট করা পোকাগুলোকে। একটা পোকাও আদৌ আলোটাকে স্পর্শ করতে পারছে না।

আমিই সাহস করে বেড়িয়ে পরেছি ধ্রুবতারার আলোটাকে খুঁজতে। তবু যেন ওটা মরীচিকা হয়ে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। ধরতে গিয়ে, বুঝতে গিয়ে, জানতে গিয়ে, অনুভব করতে গিয়েও অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে মিলিয়ে। আমার ভাবনা থেমে গেছে তালহীন চিন্তার আশ্রয়ে। স্বপ্নে ওড়া গাংচিলটা যেন ওই পোকাগুলোর মতো হঠাৎই মুখ থুবড়ে পড়ছে সুদূর প্রসারী মরীচিকার আঁধারে। আমি তো উড়তে চাই বিহঙ্গের মতো।

ধরতে চাই...
উড়তে চাই...
পেতে চাই...

পেখম মেলে ময়ূরের মতো অবিরাম নেচে বেড়াতে চাই। সেই নেশায় এখনও ছোটা মরীচিকার পেছনে। আলেয়ার স্বপ্নে। তবে কী ঠিক ওই পোকাগুলোর মতো ছুটছি, না-দেখা, না-চেনা ভবিষ্যতের অন্ধকারে? জীবনের ছাঁচে ফেলতে তাকে স্বপ্নের সাজানো অঙ্কে?

ফ্লোটেলের ডেকে সৌরিকের সঙ্গে বসে প্রথম প্রেমের জোয়ারে ভেসেছিলাম। ভালোবাসার দিগন্তে তারা গোনারও চেষ্টা করছিলাম সন্ধ্যাতারা জ্বালাবার স্বপ্নে। তারারা থেকে গেছে আলো-আঁধারি অনিশ্চয়তায়। কোনটা আজও জ্বলছে, কোনটা নিভে গেছে, আজ জানি না এত বছর পরে।

কী করে খুঁজে পাব তবে ধ্রুবতারার নিশানা?

হ্যাজাকের আলোটা আসল প্রতিবিম্ব নয়। হয়তো এই অন্ধকারটাই আসলে উজ্জ্বল। ভালোবাসা, আবেগ, চাওয়া, পাওয়া সব কিছুই সেই আলোর বাইরে। বিশাল এক অন্ধকার মহাকালের মহামন্ত্রে। আজও হইনি সেই মন্ত্রে দীক্ষিত।

কী করে জানব আসবে কবে সেই সকাল?

পাখির কলকাকলিতে ভরিয়ে দেবে আঁধারের কাল।

আলো-আঁধারের মেলায় তাকিয়ে মনে হল মুখ থুবড়ে পড়া পোকাগুলো তো খুঁজছে অন্ধকার থেকে সাইফন করা কোনও কৃত্রিম আলো। তুলে আনতে চাইছে আঁধারের থেকে ধার করা যৎসামান্য আভা। তাই দিয়েই ভরাতে চাইছে অর্থহীন অস্তিত্বের শোভা। ধার করা জ্যোৎস্নার আলোর পর্যন্ত পৌঁছবার সামর্থ্য নেই। মিথ্যেই খুঁজছে অনন্ত শূন্যে আলোর লৌহকপাটের সোনার চাবিকাঠি। ছুটছে, মরছে, আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে ছুটতে চাইছে। গরমিল সোনার কাঠি পাল্টে রুপোর চাবি নিয়ে খুঁজছে বারবার। দরজাটার কপাট কিন্তু বন্ধই প্রতিবার। চাবিটা যে ওই মহাশূন্যের বুকে। আমাকেই খুঁজে পেতে হবে ইহলোকের আলোকে। না-দেখা ধ্রুবতারাটাকে।

এটাই কী অতীতের আয়নায় বর্তমানের মুখ?

না কি ভবিষ্যতের বালুচরে খুঁজে বেড়ানো না-পাওয়া চিরসুখ?

ওই যে পোকাগুলো হ্যাজাকের কাছে এসে মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করছে। জীবনটাও তো ঠিক ওদেরই মতো। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে বেঁচে থাকা। ভালোবাসার আসমানি রঙে ভাসা।

দ্বৈত জ্যোৎস্নায় প্রতিদিন অবগাহন।

জীবন মৃত্যুকে সাজাতে মনের আবেগে প্রতিক্ষণ।

তারই মধ্যে...

কল্পনার মালা গাঁথা। ছবি আঁকা। প্রাণ ভরে স্বপ্ন দেখা।

কেউ অবজ্ঞায় দূরে ঠেলে দেবে। কেউ বা আপন, কেউ বা পর বলে কাছে টেনে নেবে। সরল বিশ্বাসে তাদের কোলে মুখ লোকাবে।

এই অন্ধকারের কি কোনও রোশনাই নেই?

রং নেই?

বর্ণ নেই?

অনুভূতি নেই?

সবটাই কী তবে মিথ্যে...

মনে হল, এই নৈঃশব্দ্যের মধ্যেই তো জাগতিক দীপাবলি। নিছক কল্পনার মধ্যে নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্যের আলোয় এক মহা-মিথ্যের মায়া।

ফিঙে পাখিটা ফের অন্ধকারের বুক চিরে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আরও কয়েকটা পোকাকে। আলোর মায়ায় শিকার আর শিকারির খেলা। গতিময় জীবনের এ-ও এক অংশ। আহা! বেঁচে গেল পোকাগুলো। মুক্তি পেল। মিথ্যে রোশনাইয়ের পেছনে ছুটতে হবে না আর। অন্ধকার থেকে আলোর জলসাঘরে প্রাণ এভাবেই মুক্তি পায়।

পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত তো শুধুই ছুটছি। এই প্রথম থমকে দাঁড়ানো। অনুতাপ নেই। নেই কোনও চাওয়া। চাওয়া-পাওয়া একাকার হয়ে গেছে আজকের চেতনায়। জড়তা কেটে গেছে। না-পাওয়া কষ্টকর ভাবনা থেকে মুক্তি দিয়েছে। বন আর পাহাড়ের ওপর ঢেকে থাকা অন্ধকার যেন অনন্ত সকালের আভা। দেখতে পাচ্ছি নিজেকে। নিজের আলোয়।

এক সময় হ্যাজাকটা নিভে গেল। আর কোনও সরল অন্ধকার নেই। আলোয় ভরা ঝলমলে আকাশ। ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কিরণ ভরিয়ে দিয়েছে ভূলোক, অসীম আকাশকেও। সেই আকাশে প্রেমের সুর। যার জন্য এখানে আসা। আজ অন্ধকারের ছটায় সেই রাগ-সুরের মূর্চ্ছনা, অজানা ছন্দের বন্দনা গানে। চিরন্তনের স্বরলিপিতে লেখা অচেনা সুরের উচ্ছ্বাস মুখরিত কলতানে।

প্রয়োজন শুধু ওই ফিঙেটাকে। সে আমায় ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে অপার্থিব মহাবিশ্বে। মিথ্যে থেকে সত্যের বর্তমানে।

কীসে আনন্দ?

কীসে মুক্তি?

কীসে আমার পরিতৃপ্তি?

সভ্যতার থেকে নিমেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাচীনতাকে যেমন দেখা যায়, নিজেকেও হয়তো আরও একটু বেশি কাছে পাওয়া যায়।

কাল রাতে অন্ধকারে তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সূর্যোদয় দেখব বলে। অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম।

মধ্যরাত্রি। অন্ধকারে ঘুম ভেঙে গেল। ভাবছিলাম ব্যাগ থেকে একবার ডিজিট্যাল ক্যামেরাটা বার করি। নাঃ... থাক। ফ্রেমে বন্দি করার কোনও মানেই হয় না।

কাশ্মীরি শাল জড়িয়ে বারান্দায় এসে বসলাম। অন্ধকারে ঝিকমিক করছে বরফ-শৃঙ্গ। নীচের দিকে অনাবৃত অংশগুলো ঝিলিক মারছে হিম আলোর মাঝে। ঢেউ তোলা হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে মনে হল, ওই নিস্তব্ধ পাহাড়ের ধ্যানের ওপারেই কি সেই 'এলসহোয়ার'-এর হাতছানি? নাকি, সবই মনের ভুল, মায়া?

আচমকা ধীর মন্থর গতিতে লক্ষ-কোটি মাইল নিমেষে পেরিয়ে, আছড়ে পড়ল এক আলোর রেখা ত্রিশূলের তিনটে ফলায়। ভোরের প্রথম আলো মহাসংগীত বাজিয়ে গেল ওঙ্কার ধ্বনিতে। মায়ের আঁচলে ঢেকে দিল ত্রিশূল। সোনালি আলোর আচ্ছাদনে। নীচে রক্তিম আভা উদ্ভাসিত। মুহূর্তের মধ্যে লাল আর সোনালি মিলেমিশে ঝর্নাধারার অবারিত প্লাবনে সব কিছু রঙিন। সূর্যের ছটা ভরিয়ে দিয়েছে লোকাতীত অন্ধকার। চিরকালীন রংমশাল আলোয় ভরিয়ে দিচ্ছে দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড। সামনে চরাচর, ব্যাপ্ত মায়া। বহুদূর দেখা যাচ্ছে। দিগন্ত জুড়ে পিতৃসম হিমালয়। ত্রিশূলের রূপ স্পষ্ট হচ্ছে সোনাঝরা আলোর বন্যায়। ঝকঝক করছে আশ্চর্য চূড়াগুলো। ত্রিশূলের ওপারে সূর্যের আভা হোলি খেলছে।

বারান্দার কফি টেবলের ওপর পা রেখে চায়ে চুমুক দিতে দিতে তাকিয়েছিলাম দূরের পাহাড়ের দিকে। এক-নাগাড়ে তাকাতে পারছি না। চোখে জ্বালা। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলাম না আর।

ভোরের আলোয় অনুভূতির কম্পন। বাজছে দক্ষ মিউজিক অ্যারেঞ্জারের নতুন সিম্ফনি। অবশেষে তার স্বরলিপি খুঁজে পেয়েছি ত্রিশূলের ওপারে, অসীম দিগন্তে। আমি শুধু অর্কেস্ট্রার নীরব শ্রোতা। এখন তা প্রকৃতির লীলা, কোমল থেকে নিখাদের সপ্তমাঙ্গিক মার্গের ঝালায়। মহাকালের মেলায়।

ভালোবাসার অঙ্ক খুঁজতে গিয়ে, সরগমের নিখাদ পেরিয়ে ভাসছি অনন্ত প্রেমের স্বপ্নে। অনন্তের গভীরে। কালের বলয়-চেতনায়। বুঝলাম জাগতিক চাওয়াটা সোনার পাথরবাটি, মহাকাল নামক না-জানা ব্যাপ্তির মালায়।

নিঃশব্দে একভাবে ত্রিশূলের চূড়ায় চেয়ে শিউরে উঠলাম!

হৃদয়ের স্পন্দন অন্য সুর গাঁথছে দিবালোকের আলোয়। ছন্দহীন এক অনাবিল আনন্দের জোয়ারে ভাসা। স্বপ্ন মিছিলে হারিয়েছি অনন্ত মহাকালের বুকে একা।

তাকিয়ে ছিলাম ত্রিশূলের দিকে। শিবের ত্রিশূলের কথা মনে পড়ে গেল। ত্রিশূলের তিনটে শূল হচ্ছে ট্রিনিটি। সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয়। সময়ের ভাষায় অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। দার্শনিকের যুক্তিতে অবচেতন, চেতন আর অতিচেতন। আলোর ঝলকানি দু-চোখ ভরে দেখছি। মনে তোলপাড় করছে ট্রিনিটি। গতকাল অন্ধকারের অনুভূতিটা মিশে যাচ্ছে সকালের আলোয়।

এ আলো তো আজকের নয়।

এ আলো তো কালকেরও নয়।

এ তো যুগ-যুগান্তরের ভাবনা দিয়ে গাঁথা অবিচল রশ্মি।

কোনও দিন হারাবে না দিন-রাতের লুকোচুরি খেলায়। চিরকাল রয়ে যাবে সত্ত্বার প্রহরায়। চেতনার নব অভ্যুদয়। ক্ষীণ আলো দেখতে পাচ্ছি মহাবিশ্বের মেলায়। জানা অঙ্কের সমাধান ছাড়িয়ে হারিয়ে গেছে ভূমণ্ডল। সীমিত চিন্তার বলিরেখা পার হয়ে ভাসছি অসীম মহাশূন্যের সাগরে। অনন্ত গভীর ভালোবাসার সন্ধানে। কালের নখদর্পণের চিহ্ন পেরিয়ে রয়ে যাবে অন্ধকার থেকে আলোয় পাড়ি দেওয়ার মুহূর্তটুকু। থাকবে না ভালোবাসায় কোনও প্রত্যাশা। খুঁজছি তাকে অনাদি কালপ্রবাহের ঊর্ধ্বগামী স্রোতে।

হারিয়ে গেছি, মহাশূন্যে কায়াহীন অন্তহীন পথে।
অনাদিকালের আচ্ছাদনে পুষ্পক রথে।
হারিয়ে গেছি, দিগন্ত বিস্তৃত কালের মায়ায়।
হারিয়ে গেছি, অনন্ত প্রেমের নব চেতনায়।
হারিয়ে গেছি, শতাব্দীর সীমা ছাড়িয়ে মহাকাশের শূন্যে।
পূর্ণতার মন্ত্র খুঁজে পেলাম উদ্ভাসিত প্রত্যুষে।
কেটে গেছে স্বপ্নঘোর, ক্ষুদ্র জাগতিক বাসনা।
কণ্ঠে শুধু অস্ফুট স্তবের মহা ওঙ্কার ধ্বনি।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি।

বিশ্ব প্রেমের চেতনা জাগলে কোন সাংসারিক প্রেমের আশ্রয় বাঁচব? সেখানে সৌরিক, মৌনিস সবাই যে কত নগণ্য। সাংসারিক মায়াজাল বন্ধন বই, মুক্তির পথ হতে পারে না। মুক্তি আমাকেই খুঁজে নিতে হবে অন্তহীন চেতনার আলোড়নে।

যেখানে নেই কোনও পূর্ণতা...
যেখানে নেই কোনও শূন্যতা...
যেখানে নেই কোনও অতৃপ্তির ছোঁয়া...
যেখানে নেই কোনও ভালোলাগার মায়া...

যেখানে নেই কোনও বিষাদে ঢাকা ধূসর মেঘ।
দিগন্ত পড়ে থাক মরীচিকার কোলে।
অনন্ত খেলে বেড়াক মহাকালের দোলে।
গাঢ় রাত্রির অমানিশা ভরে গেছে আলোয়।
দোলাচল থেকে পূর্ণতার দিশায়।
তাই দিয়ে গাঁথা হোক অনন্ত প্রেমের গ্রন্থি।
জ্বলবে সে দীপ চিরদিন,
উদ্ভাসিত মঙ্গলালোকে চেতনার নব রবির পঙক্তি।
নতুন প্রেমের স্বচ্ছ সরল ছবি,
চেতনার উদ্ভাসের তুলির নব স্পর্শে।

দিগন্তের সীমারেখা ধাবমান মরীচিকার মতো দূরে সরে যাচ্ছে। সীমা নিঃশেষে অসীমের মধ্যে দিশার সন্ধানে। মুছে যাচ্ছে অনন্তের চেনা রেখাগুলি। ক্রমশ সীমিত, অর্থহীন, বিলুপ্ত। আমার চেতানা অতন্দ্র অন্ধকারের বুক চিরে প্রশস্ত আলোয়। প্রেমের অমৃতসুধা পান করছি নিজেরই মননের নিলয়ে। অনন্ত মিশে গেছে, না-বলা ছন্দের সুরহীন স্রোতে। জ্বলছে আলো, ফুটছে গোলাপ, অন্ধকার শেষের ভোরে। ভালোবাসা এখন কায়া ছেড়ে বিশ্ব চরাচরের মঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে জাগ্রত। জাগিয়ে কল্লোল, তুলছে হিল্লোল পাওয়ার নতুন ছন্দের আনন্দ। আমার কায়াহীন নির্মোহ আত্মা বাঁধা পড়েছে বিধাতার অন্যন্য সৃষ্টির অন্তহীন প্রেমে।

পাঁচ

বিনসরের একাকী নির্জনে বসে শান্তির পথের সন্ধান এক জিনিস আর কলকাতার বাস্তবের সঙ্গে মেলানো আরেক।

ছুটি শেষে কলকাতায় ফিরে দ্বন্দ্ব দোলায় আমি। অস্তি, আত্মা, গো, সল, আমিত্ব যাই বলি না কেন সেটা একান্তই আমার নিজস্ব। যখন আমি একা অন্য। কিন্তু চাকরি জীবনের বাস্তবে আরেক টানাপড়েন। নাস্তি, রাবণ, অসুর, শয়তান, রক্ষ যে নামেই ডাকা হোক, সেই জাগতিক পিছুটান আমাকে আবর্তে ছুড়ে দিয়েছে। আমার সত্ত্বাটা এখন আপেক্ষিকতার ক্ষীণ অথচ দৃঢ় সুতোয় ঝুলছে। আমার আমি এখন কোন দিকে মোড় নেবে? জাগতিক টান এক জিনিস। মুক্তি চিন্তায় বিবেকের তাড়না অন্য।

আমি কী জাগতিক চৌহিদ্দির মধ্যে স্বতন্ত্র হয়ে টিকতে পারি? তাহলে কী গৌতম বুদ্ধর ‘আত্মদীপো ভব’ একমাত্র পথ? চটভরি-আর্য-সত্যানি বা ফোর নোবল ট্রুথ একমাত্র মুক্তি এই বাহির আর অন্তরের আপেক্ষিক দ্বন্দ্বে? বস্তু, অনুভূতি, দৃষ্টি, মানসিক গঠন, চৈতন্য এই পাঁচ স্তরের মধ্যে কী আমার মানসিক ব্যপ্তিটাই আজ দ্বন্দ্ব দোলায়?

মৌনিসকে গ্রহণ করে সংসারী হওয়া এক। আর সব ছেড়েছুড়ে বাউন্ডুলে জীবন যাপন আরেক। কিছুতেই কিছু যায় আসে না। সব লাফালাফিই তো দু’দিনের। তারপরে তো সেই অনন্ত অন্ধকার। ওপারে কী? তমসঃ পরস্তাত আদিত্যবর্ণ পুরুষ কী শুধুই কবির কল্পনা, না সত্যি?

সীমা-অসীমের বাইরেই কী মিনোস্কি ডায়াগ্রাম? পরম রহস্যময় পথ। সেখানে পা বাড়াব কোন সাহসে? জাগতিক সব চাওয়াকে তো ত্যাগ করার জন্য এখনও মানসিক ভাবে প্রস্তুত নই।

সংসার মানে স্থায়িত্ব।
কামনার পরিপূরণ।
সংসার মানে
যুগ্ম বাসনার স্ফুরণ।
সংসার মানে
অনুভূতি বিনিময়
আনন্দ, দুঃখের সহায়।
সংসার মানে
একাকীত্ব থেকে প্রতিত্রাণ।
একঘেয়ামি ক্লান্তির অবসান।
সংসার মানে
পুত্র, কন্যা ভরাট জীবন
জাগতিক পূর্ণতার শ্রেষ্ঠ সোপান।

মা তো এই জাগতিক পূর্ণতা আস্বাদন করেই শময়িতা মঠে নিজেকে অর্পণ করেছে। আমার তো সেসব এখনও বাকি। কী করে মোহমুক্ত হব এসব ছেড়ে? জীবনটাই কি হয়ে যাবে ফাঁকি। ভোগ না করলে যে ত্যাগ করা যায় না। আমার তো ভোগের ভিক্ষাপাত্রই অসম্পূর্ণ। ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হব কোন সাহসে? ভোগ-ত্যাগের দ্বন্দ্ব দোলায় দুলছি আরোহণের ক্ষীণ সুতোয়। ছিঁড়লেই মহাশূন্য, অন্ধকারের তলায়।

প্রজ্ঞানন ব্রহ্ম থেকে পাওয়া জাগ্রত চেতনার বিন্যাস। তার দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিন্যাসেই জাগতিক জীবন। পঞ্চেন্দ্রিয়কে যে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। যা কিছু জানি সেটা আমার জ্ঞানেরই ব্যপ্তি। বিজ্ঞান ব্যাখ্যা। সত্ত, রজ, তম ক্রমশ অচৈতন্য থেকে চেতনায়। এই সীমার বেষ্টনী ছেড়ে কোন অসীমে পাড়ি দেব আমি!

চাকরি, ঘর, মৌনিস কলকাতার রসপূর্ণ জীবন।
এই স্থায়িত্বর বাইরে কোথায় আমি?
কোথায় আমার বলাকার পাখনা মেলা
উদাসী বাউন্ডুলে মন?
বিফল কি তবে পূর্ণ যৌবন?
তার ভরা গাঙের জোয়ার
এখনও পৌঁছয়নি রজনিবৃত্তির দ্বারে।
কী করে নেভাব কামনার জ্বালা?
গাঁথতে একাকী বৈরাগ্যের মালা।

আমার আপেক্ষিক সত্ত্বাটা দোলাচলে দাঁড়িয়ে হিসেব মেলাচ্ছে নিজকে চিনতে। পাপ-পুণ্য, চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা একত্রিত করে নিজেকে সব কিছুর সাথে মেলাতে। বুঝতে পারছি, নিজেকে আরও ভালো করে বুঝতে হবে। নিজের লক্ষ্যটাকেও।

ছাড়তে হবে বন্ধন, ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ।

ছাড়তে হবে বিভাজক বাক্য বিনিময়।

ছাড়তে হবে হত্যা, যৌন সদাচরণ।

ছাড়তে হবে অবাঞ্ছিত অন্তরের ক্লেশ।

কাজের দিক থেকেও, স্বঠিক পথে অন্যদের ক্ষতি না করে, অগ্রসর হওয়া কী সম্ভব? নেতিবাচক চিন্তা ছেড়ে ধনাত্মক চিন্তাভিমুখী না হলে হলে এই দোলাচল থেকে মুক্তির পথ নেই। দেহ, মন, চিন্তা, অনুভূতিকে একত্রিত না করে সর্ব সত্ত্বায় নিবিষ্ট মনকে অন্তর্মুখী না করতে পারলে আমার চেতনা, আমার সমগ্র সত্ত্বাকে ছুঁতে পারবে না।

না ছোঁয়া পর্যন্ত, নিজের ঘূর্ণাবর্তে আমি বন্দি।

মা বিচ্ছিন্ন হলেও, মৌনিস সেই আবর্তের কাণ্ডারি। তবে কী সত্যি সত্যি ভালোবেসে ফেলেছি ওকে? সংসারের নতুন স্বপ্নে? যে আমিটা পুরুষ সংসর্গ থেকে পালাতে চাইতাম, তাকে কোন অদৃশ্য ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে জৈবিক আবেষ্টনীতে। জীবনের সপ্ত সুরের নতুন রাগে। তাই পিছুটান, বন্ধন, চিত্ত আলোড়ন।

কোনটা আমার প্রকৃত সত্ত্বা?

কোনটাই বা আমি?

প্রাজ্ঞানম-ই চৈতন্যে উত্তরণ। ঋগ্বেদের ধ্রুবতারাই ব্রহ্ম কি না জানি না। মহাব্যোমে খোঁজা মানে জাগতিক বলয়ের বাইরে। সেই অজানায় কী চেতনার পূর্ণতা পাওয়া যাবে? মানুষ যদি অমৃতাস্য পুত্রই হয়, ব্রহ্মাণ্ডের ইউনিভার্সাল এনার্জির একাংশ, তবে কোন অজানা অসীমে খুঁজব উত্তরণের চেতনা? তা কী কেবল মুনি-ঋষিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? না, আমার মতো সাধারণ মানুষের মধ্যেও?

অহম ব্রহ্মাস্মি বলে, ঘুমের সময় বা সদ্য জাগ্রত শিশুর জাগরণেই অচৈতন্য। জানা নেই অস্তিত্ব। অথবা আধ-চৈতন্য স্বপ্নের ঘোর। জানা, কিন্তু দেখার ক্ষমতা নেই। জাগ্রত ‘চেতনা’ পঞ্চেন্দ্রিয়র আমিত্ব বাসনা। সীমার মধ্যেই খ্যাতি, দ্যুতি থেকে অবলুপ্তি। শিকল বাঁধা সাংসারিক বলয়ে আমিত্বের ব্যপ্তি, আস্ফালন। ব্যক্তি অহং ছেড়ে চেতনার মার্গে ছোটার চেষ্টা বৃথা। ব্রহ্ম দর্শন, আত্মাকে খোঁজা ফলহীন প্রচেষ্টা।

আমার আমিকে না বুঝে অনির্দিষ্ট অসীমের নামে শুধুই খেলা?

প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার মধ্যেই তো অধিষ্ঠান।

আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি।

এত কিছু পড়েও খুঁজে পাইনি বর্ণিত অসীম। শ্বাশ্বত গ্রন্থ থেকে কবিগুরু। সীমার নাগপাশেই সীমাবদ্ধ। অসীম ধোঁয়াশা। এখনও অজানা, অচেনা। মাণ্ডুক্য উপনিষদের চেতনার ব্যাপ্তিতেও অসীম এখনও অজানা। জাগ্রত স্তরে তো কেবল নিজেকেই দেখা। অস্তিত্বের তারতম্য নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অচৈতন্যের আরেক রূপ। স্বপ্নেও অর্ধ-চৈতন্য। ঘুমের আমি আর বাইরের আমির তারতম্য

ভেদে এখনও আমি অপারগ। এ কোন আমি? গভীর সুপ্তিতে আমিটাই আচ্ছাদিত। দেহ, মন, ইন্দ্রিয় যদি অস্তিত্বহীন হয়, কোথায় সেই তুরীয়, যেখানে আত্মজ্ঞান জাগ্রত। আত্মা ব্রহ্ম মিলেমিশে একাকার? যেখানে নিদ্রা, জাগরণ সব-ই আপেক্ষিক।

আমি তো মুনি-ঋষি নই। সিদ্ধপুরুষও নই। নিতান্তই সাধারণ বাঙালি মহিলা। আমার শান্তির পথ কী পুঁথির পাতায়? না, হিমালয়ের গুহায়? সংসার পেছনে ফেলে আলো আঁধারিতে। শান্তি যদি এই কঠিন অজানায়, আমার মতো সাধারণ তো দোলাচলে ঝুলবেই। কী করে পাব তার সন্ধান?

নিউ টাউনের ফ্ল্যাটের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম অন্ধকারে রাতের কালোয়। দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত একটা কালো চাদর বেছানো। পরম রহস্যময় একটা কিছুর অস্পষ্ট আভাস জড়িয়ে রয়েছে সেই পর্দাটার আনাচে কানাচে। একটা ভয় ভয় করা সম্ভাবনা। অস্পষ্ট প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠাময় অপেক্ষা। অথচ সেই কালো চাদরটার একটা পাগল করে দেওয়া রং। অন্য ঔজ্জ্বল্য । অজস্র তারার চুমকিগুলো চুপি চুপি জোনাকি আলো ছড়িয়ে সেই কালোকে আশ্চর্য রহস্যময় মোহময়ী করে তুলেছে।

আগে কখনও অমাবস্যার রাতের এ রূপ দেখিনি। দেখলেও হয়ত খেয়াল করিনি। কেই বা করে? একটা রাত কতজনের কাছে কত বিভিন্ন অর্থ, ইমোশন বয়ে আনে। আবার সময়ের স্রোতে কোথায় হারিয়ে যায়। কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ বা মনেও রাখে না। অমোঘ নিমরডের দৃষ্টি নিয়ে রাত তাকিয়ে থাকে। নির্নিমেষ দৃষ্টি কখনও হয়ে ওঠে পরুষ কঠোর, কখনও মমতায় করুণ, কখনও বা দুঃখের আঁচে সজল।

ক'জন জানতে পারে?

আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হল একটা গুমড়ে মরা কান্নার রেশ যেন ছড়িয়ে আছে আকাশ জুড়ে। অক্ষমের হতাশার দীর্ঘশ্বাসের শীতল বাতাস হঠাৎ যেন কোথা থেকে হুহু করে ছুটে এসে আমার রণক্লান্ত মনটাকে ঘিরে ফেলল। কালো চাদরটার পরতে পরতে জমা অযুত যুগের নিযুত ব্যর্থতার কালো কালো ধুলোর ঝড় যেন আমার শ্রান্ত দেহের ফাঁকফোঁকরে ঢুকে গেল। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। অচেনা কান্নার দলা আমার অন্তরের অলিন্দ-নিলয় থেকে উঠে এল। সেই কালো কান্নার দলাটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগল গলা, সুষুম্নার ব্রহ্মনাড়ি, স্পাইনাল কর্ড বেয়ে। উঠতে উঠতে পৌঁছে গেল আমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে, স্মৃতির ভান্ডারী অ্যামিগডালার অন্দরে। আমার ইমোশনের গোপন কুঠরিতে। নিজস্ব চেতনার গহন গভীর পরম আপন আত্মার সোনার ঘরে। অমাবস্যার রাত কিভাবে যে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে আমার ঘুমন্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলল, বুঝতেও পারিনি।

সেই অন্ধকার আকাশে সাজো সাজো রব। লক্ষ কোটি তারা অলিন্দে জ্বালাচ্ছে ঝিকমিকে আলোর রংমশাল। কয়েকটা বড় তারা গম্ভীর দেখছে। মেজো তারাগুলোর মিটমিটে হাসি। ফচকেগুলো আকাশগঙ্গায় আলোর নদীতে হুটপাটি করছে। উচ্ছল হাসি ছড়িয়ে ছটিয়ে হাজার আলোর ফুলকি। আনমনে আকাশের দিকে তাকালাম। তারার আলোয় কালো আকাশে মায়াময় মূর্ছনা। কারা যেন হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে সেখানে।

হঠাৎ চোখ পড়ল পশ্চিম আকাশে। তার গায়ে আধফালি চাঁদ। উজ্জ্বল নয়, অনুজ্জ্বলও নয়। আকাশের গায়ে আলগোছেলে পটানো পার্থিব চাঁদকে দেখে মনে হল, এই চাঁদ যেখানে লেগে, সেটা নিতান্ত শূন্য আকাশ নয়। আলোর বন্যা আর আঁধারের জ্যোৎস্নাতো তার মধ্যেই। পুঁথির ধোঁয়াশায় নয়। আমার অচেনা আমিকে দেখার মধ্যেই তো অসীমের স্বাদ। নিজেকে দেখা, চেনা, বোঝার মধ্যেই

আলো। অসীমের আঁধারে নয়। আদেখা আমিকে দেখে ভয়কে জয়ের পথেই পূর্ণতা। সীমাহীন আকাশের অদৃশ্য কোণায় নয়। সীমার বন্ধনে, চেতনার উন্মেষেই শান্তি। যেখানে বাহির আপেক্ষিক।

সাংসারিক পথে, নিজেকে চিনেই পৌঁছতে পারব সেই অমৃতলোকে। মৌনিসকে নিয়ে ঘর বাঁধলেও তা অসম্ভব নয়। যেখানে সাংসার রথ আধ্যাত্মিকতায় মিশেছে। উন্নত চেতনার আলোকে। হিমালয় গিয়ে তপস্যার প্রয়োজন নেই। ধ্রুবতারাটা মহাব্যোম ছেড়ে প্রবেশ করেছে আমার অন্তরের গভীর গোপন অজানা কুঠরিতে। সেখানে তারার আলোর রোশনাইয়ে অনন্ত দেওয়ালির মহাসংগীতের বৃন্দগান। জীবলোকের জৈবিকতার মধ্যেই লোকানো সেই অচেনা স্বপ্নে দেখা অমৃতলোক।

মনটা ভরে গেল পরম আশ্রয়দায়িনী শান্তির মন্ত্রে। প্রকৃতির কোলেই নিজস্ব পূর্ণতার আলোতেই তো আমার সব লোক।

মোহের অদৃশ্য অন্তরলোক।

আমার জীবলোক।

ইহলোক, পরলোক।

সব লোকের সমন্বয়ে

অন্তরের মহালোক।

অন্তরের প্রণব ধ্বনি বোধহয় ক্ষীণ হলেও শুনতে পাচ্ছি। বাস্তবে মনকে নিয়ে যেতে চায় ইহলোকের স্বপ্নমহলে। অগম্য পরম প্রশান্তিময় ভূলোকে।

ছয়

জাগ্রত অন্তরের মহালোক থেকে ইহলোকের বাস্তবে ফেরত এলাম। মধ্যপন্থা বেছে নেওয়ার ডাক। চেষ্টা করে দেখাই যাক না কেন। সাংসারিক পথেই আরোহণ সম্ভব কি না।

দোলাচলের বাস্তবিক সমাধান।

ভাবনার ক্ষণিকের বিশ্রাম।

ঘূর্ণাবর্তে মানসিক আরাম।

তাই মৌনিস। বিয়ে তো স্থায়ী বন্ধন। নির্ণয় সঠিক কি না বোঝার আগে ঝাঁপ দেওয়া বোকামি। তাই সাত পাকে বাঁধা পড়ার আগে বাস্তবে পরখ করে দেখা। মৌনিস উঠে এল আমার নিউ টাউনের ফ্ল্যাটে। লিভ-ইন রিলেশনশিপ। লিভিং টুগেদার। কেতাদুরস্ত বাঙালি সাহেব এখন আমার রোজকার সহচর।

মৌনিস ঘরে কম্পিউটারে কাজ করছে। আমি বারান্দায় বসে সামেনের আলো-আঁধারি বিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতার দিকে চেয়ে। উপনগরী রাজেরহাট নিউ টাউন অন্য সাজে। এখানে কলকাতার ঝলমলে রাতের ঔজ্জ্বল্য নেই। দেখবার ইচ্ছেও নেই। ওখানে পড়ে থাক স্মৃতি বিজড়িত সুখ-দুঃখের ইতিহাস, যা আজ ট্যান্ড, বিক্ষিপ্ত জীবনের ছন্দে। হয়ত সৌরিক তার সুখের নীড় সাজিয়েছে এই আলো ঝলমলে শহরের কোনও এক ফ্ল্যাটে, অন্য কারও সঙ্গে। সেখানে হাজার হাঙরের মতো রামগোপাল অন্য কোনও নারীদের নিয়ে ভেঁজে চলেছে নতুন সঙ্গমের বোল, কোনও নাট্যমের পুরনো আকুতিতে। বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমার সেই পৃথিবীতে। মৌনিসের হাত ধরে আঁকতে বসেছি বর্তমানের ছবি। সঙ্গে দোলাচল অবসানের অদেখা অচেনা রবি। আলো ঝলমলে রঙের বাইরে। কোনও আর্টিস্টের

কল্পনার তুলি দিয়ে আঁকা স্বপ্নের ছলনা নয়। কোনও সুরকারের নতুন রাগের বন্দনা নয়। জীবন্ত বাস্তবের স্বভাবিক জীবন্ত জলছবি।

হঠাত দুম করে লিভ-ইন রিলেশনশিপে কেন?

অন্যান্য মানুষের মতো এ-ও আমার ঝট করে ডিসিশন যা নিতান্তই হিসেবের বাইরে। কেন করলাম বলতে পারব না। মৌনিসের সঙ্গে নিয়তির কেমেস্ট্রি? হয়ত তাই।

মৌনিস ঘরে কম্পিউটারের কাজ সেরে আমার পাশে বারান্দায়। পেছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঘষতে লাগল। বেশ ভালোই লাগছে। আমার কামনাকে পূর্ণ রূপ দিতে উৎসুক। সাংসারিক চৌহিদ্দি ছাড়া কী সম্ভব? জৈবিক স্বর্গকে মর্তে পাওয়া? সোহাগ রাত ছাড়াই মুহূর্তটাকে স্বর্গ করার বাসনা।

মনের জানলার চারটে দিক। নিজের জানা, সকলের জানা। নিজের জানা, সকলের অজানা। নিজের অচেনা, অথচ অন্যদের জানা। মৌনিসের সঙ্গে সম্পর্কে আমার কোন দিক উন্মোচন হবে, জানি না। ওর আলিঙ্গনে আমার মধ্যে সমর্পণ, রিসেপশন, আবেগ, স্বতঃস্ফূর্ততা, সেন্সুয়াল আর্জ-এর এক অদ্ভুত পাঁচমিশালি অনুভূতির সংমিশ্রণ। ভেতরে ভেতরে একটা চাপা আলোড়ন। রামগোপালের ছবি মন থেকে মুছে গেছে। একজন নারীর জৈবিক চাহিদা, যৌন আকর্ষণে বহুদিনের পুঞ্জিভূত কামনার পরিত্রাণ খুঁজছে চাপা আবেগে। ভাসতে চাইছি কামনার স্বর্গে।

লিখতে ভবিষ্যতের গ্রন্থি।
আগামী দিনের শান্তির ছবি।
গড়তে পূর্ণতার প্রতিমূর্তি।
মধুর মিলনে।

দেখতে নিজেকে অন্যভাবে, অন্যরূপে। কী ভাবে? মাইক্রিস্কোপিক, না টেলিস্কোপিক, না বার্ডস আই ভিউ দিয়ে? ঠিক জানি না।

রজনীগন্ধার মালা পরে নয়। বেনারসি সাজে ফুলসজ্জার বাসরে নয়। শুধু মুহূর্তটাকে একান্ত আপন করে মধুর স্মৃতি ভরে। ছন্দের স্পন্দনে সাঁকোর মতো জড়িয়ে থাকবে এই অদৃশ্য মালার বর্ণাঢ্য সম্ভার। সেটাই পাথেয়, যা হবে আগামী দিনের পূর্ণতার উপহার।

জীবনের চলার পথে পরিবর্তন মাস্ট - সেটা শুধু আমাদের কাজের প্রেক্ষাপটেই নয়, মানসিক ক্ষেত্রেও। এই পরিবর্তনের খোলস পাল্টাতেই নতুন রঙের মাধুরী। নব রূপে আত্মপ্রকাশ। সেই রং দিয়ে আগামীর কাব্য লেখা। আমার অবচেতনের বাস্তব ছবি আঁকা। নতুন রঙের সংমিশ্রণে। নিজের মাধুরী দিয়ে সাজাতে। যা অমলিন অক্ষত থাকবে সময়ের বিবর্তনে। চিরবসন্তের নব-পল্লবের বাহারে। পলাশের ফাগুনের হাওয়ায় খুলে দেবে মনের বন্ধ দরজাগুলো আগামী পরিপূর্ণতার সম্ভারে।

মনে হল, এই মুহূর্তটা ধোঁয়ার মতো। বোঝবার আগেই, পলক ফেলতে নিমেষে মিলিয়ে যাবে। আমাদের চাওয়া-পাওয়ার মতো। রাতের আলো-আঁধারি উষ্ণ আবেগে সেই সুর শোনাচ্ছে। মৌনিস হুইস্কির মাদকতায় দেহের আগুনে আরও বেশি করে ঘি ঢালছে। আলতো করে আলিঙ্গন ছাড়িয়ে বাথরুমের দিকে পা বাড়ালাম। কিছুক্ষণ পর পাতলা ফিনফিনে সুতির নাইটিতে বসলাম খাটে আধা শোয়া মৌনিসের পাশে। ও দুহাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নিলো আমাকে।

সেই মুহূর্তে দুটি যুগল আত্মা মিশে গেল যুগ-যুগান্তরের স্রোতে। অনাদি কালের তেপান্তরে। আমরা তো দুজনেই চাইছি মুহূর্তটাকে হৃদয় ভরে। মৌনিসের অবয়বটা বেডসাইড ল্যাম্পের আলো-আঁধারিতে, বারান্দার থেকে স্পষ্ট। উষ্ণ অনুভূতি ফণা তুলে উঠছে। ফিনফিনে নাইটির পেছনে লুকিয়ে থাকা অবয়ব বারবার সেই আগুনের সুর শোনাচ্ছে। আমিও প্রস্তুত অনেক সংস্কার, বাধা লঙ্ঘন করে, ওর কোলে নিজেকে মেলে ধরতে। আজকে না হয় দিনের শেষে নিজেকে উজাড় করে দিলাম। পাওয়া না-পাওয়ার হিসেব না হয় কাল বুঝে নেব।

সেই মুহূর্তে চারধারের সব কিছু বিলীন হয়ে গেল আমাদের যুগল চাওয়ার উষ্ণ বহ্নির উত্তপ্ত প্রলয়ে। যেন সুনামি রচনা করছে দেহের প্রতিটা কোষে। জ্বলছে দেহ, নীরব মন, চাইছে আলো, বাসনার স্রোতে। সুনামিটা ক্রমশ আমার দেহে কামনার লাভা ছড়াচ্ছে। প্রতিটা কোষ জুড়ে আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

আর নয়...

আর বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারব না নিজেকে। বেডসাইড ল্যাম্পের আলোটা একটা মায়াবি ঘোর সৃষ্টি করেছে। চোখ বুজে নিজেকে সঁপে দিলাম ওর বাহুডোরে।

জানি না কতক্ষণ!

এখন আমি সজ্জাহীন, অপরূপা। আমার শ্যমলা বস্ত্রহীন অবয়ব ওর রোমশ দেহে ছন্দ ছড়াচ্ছে আবেগের প্লাবনে। আমার নিটোল চোখের গাঢ় দৃষ্টি, আমার উষ্ণ অধর, আমার শাঁখের মতো চিবুক, আমার সুন্দর গলা, আমার তুলতুলে জ্যোৎস্নার মতো কান, আমার বিদ্রোহ করা স্তব্ধ স্তন, আমার ঢেউ খেলানো কোমরের মধ্যে দীপ্ত গভীর নাভি, আমার আকর্ষণীয় পরিপূর্ণ নিতম্ব যেন পাহাড়ের বুক চিরে খরস্রোতা নদীর কুলকুল রবে হারিয়ে যাচ্ছে ওর দেহের গহন অন্তঃপুরে। হারিয়ে গেছি স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুরের সঙ্গে বর্তমানের নবরূপের বাসরঘরে।

ও চুম্বন একে দিল আমার কপালে। দুজনের ঠোঁট ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। আমার স্তনের দুর্বার চাপ অজানা ছবি এঁকে দিচ্ছে ওর রোমশ বুকে। নিতম্বের স্পর্শে উল্কাপাত। ওকে দুহাতে লেপটে নিলাম দেহে। কখন আলো-আঁধারিতে আমারে শিথিল নাইটি লুটিয়ে মেঝেতে। আঁকিবুকি কাটছি ওর সারা শরীরে। মুক্তি দিতে নিজেকে! চিরন্তন আভরণ থেকে নির্বেদ আলিঙ্গনে...

সেই মুহূর্তে নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে থেকে বাঁধভাঙা বহ্নি ছড়িয়ে গেল দেহের প্রতিটা রন্ধ্রে। মুক্তি চাই। এই দেহ, এই মন, এই আবেগ, এই সময়, যেন সেই সুর গাইছে। অচেনা আকাশে সুনামির ঝড়ে, দেহ মন কেঁপে উঠল। আছড়ে গুঁড়িয়ে দিতে দুজনের দেহের প্রতি অঙ্গ। অনাদি বাসনার দ্বার উন্মুক্ত... ঝড় উঠেছে দেহে-মনে-শরীরী উষ্ণতার আকাশে। দুজনেই হারিয়ে গেলাম বর্তমানের প্রলয়ে। কালচক্র পিছনে ফেলে। আত্মার শ্বাস-প্রশ্বাসে। ঝর্ণার জলপ্রপাতে। শ্বাসের সপ্তম নিখাদ জানান দিয়ে গেল, আমরা হারিয়ে গেছি পার্থিব চাহিদার অসীমে।

লিভিং টুগেদার মানে আধা সংসার, পুরো নয়। বংশধরের চিন্তা করতে গেলে তো গাটছড়া বাঁধতে হয়। তার জন্য তো আমি এখনও প্রস্তুত নই। তাই পিলের ওপরেই নির্ভরশীল আমাদের মধুর মিলন। তবুও কি কখনও-সখনও আমার মুখ নববধূর মতো আলতো রঙে লাল হয়ে ওঠেনি? মলিন সন্ধেবেলায়, আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়নি নতুন রামধনু মাখা আলতায়? সিঁথিতে না পরা সিদুর ছড়িয়ে পড়েনি নৈমিত্তিকতার আছিলায়। তখন কী মুখটা জ্বলজ্বল করেনি অন্তরের আবিরের রঙে?

ফাগুয়ার হোলি খেলতে, অসময়ের ফাগুনে, আলো ভরা দিনের সূর্যকিরণ মাখতে নতুন মুনলিট সোনাটায়।

হতে গিয়েও মালা বাসি হল না প্রখর দিবার উষ্ণতায়।

জীবনের রং আঁকতে প্রকৃতিক নিয়মের আছিলায়।

নিজেকে চিনতে একাকী রাতে এই আধা সংসারের দংশন। প্রেমের স্বপ্ন তো ছোটবেলায় দেখতাম। হয়ত সৌরিকের বঞ্চনা বা রামগোপালের ধর্ষণ নয়।

অন্য স্বপ্ন।

ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে রাতের অন্ধকার আকাশটা দেখা যেত। ওই অন্ধকার আকাশে ছোট্ট আমি একটা অন্য ভাষা শুনতে চাইতাম। জানলার কার্নিশ ছাপিয়ে যেটুকু আকাশ দেখা যেত, সেটাও যেন অন্ধকারের আস্তিন পেতে গুম মেরে বসে থাকত প্রতীক্ষায়। তারাদের? যারা আমাকে জ্বলতে দেখে লাফিয়ে উঠবে আনন্দে?

অন্ধকারেও আলোর একটা ঔজ্জ্বল্য দেখতে চেয়েছিলাম। অদৃশ্য জগতের রাজপুত্তুরকে। তারাদের সিঁড়ি বেয়ে ফিসফিস করে ডাকতে 'আয়...আয়...' মনমাঝির বৈঠা নিয়ে হাতে, সপ্তর্ষির পিঠে চড়ে, আকাশগাং পাড়ি দিতে, কোনও এক অচেনা রূপনগরের দেশে। এক মোহময় অজানার হাতছানি। পার্থিব চাওয়ার অলৌকিক নিঃশব্দ আহ্বান। নাম না-জানা তারাগুলো স্বপ্নের দরজা খুলে, ছোট্ট খুকিটার মনে আলোর সিঁড়ি বিছিয়ে, স্বপ্ন পরীদের নাচের ভেল্কি দেখিয়ে, গাইত ঘুমপাড়ানি গান। জ্বালিয়ে দিয়েছিল জোনাকির ফুলঝুরি - আকাশগাঙে আনন্দের মধুকর ডিঙাতে গিয়ে বসতে ওই স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুরের পাশে।

সেই রাজপুত্তুর কি মৌনিস?

আমার জন্য যুগ-যুগান্তর ধরে বসে।

এখন এখানে অবশেষে...

ও কি যুগ যুগান্তর ধরে নৌকোয় ভেসে বেড়াচ্ছিল আমারই প্রতীক্ষায়? জানি না। সত্যি কি সেভাবে কখনও দেখতে চেয়েছি? আনমনা ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে যাওয়া, নিজস্ব দৃষ্টিতে মনটাকে দেখতে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম এতদিন। সেই দেখার হাতেখড়ি কী সেই কম বয়সে অন্তরের ছবি দেখার প্রবণতা? সেই স্বপ্নের ভেলায় চেপে দুজনে ভেসে গিয়েছিলাম বিস্তৃত মহাকালের স্রোতে।

পাশে মৌনিস শুয়ে। এ কদিন অফিসের কাজের অতিরিক্ত খাটনিতে গভীর ঘুমে মগ্ন। আমি হাল্কা ঘুমে আবার সেই রাজপুত্তুরের স্বপ্নে। রাজপুত্তুর যেন হাত বাড়িয়ে আমায় ডাকছে। ওই ধোঁয়াটে অস্পষ্ট স্বপ্নপুরীতে।

যেখানে মেঘেরা খেলে বেড়ায় আকাশের নীল কোণে।

যেখানে পাখিরা কিচমিচ করে ছোট্ট একটা নীড়ে।

যেখানে স্বপ্ন মুছে যায় না মেঘপরিদের দেশে।

আমাকে নিয়ে যেতে অমলিন এলোকেশে।

স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুরের হাত ধরে ভাসতে নতুন প্রেমের ভেলায়। রাজপুত্তুর আমার চিবুকটা তুলে নিবিড় ভাবে তাকিয়ে। তারপর খুব আস্তে আস্তে ঠোঁটটা এগিয়ে আমার মুখের কাছে। হঠাৎ আমাকে

চমকে দিয়ে 'হুম্ হুম্' শব্দ করে স্বপ্নটা ভেঙে দিল, জানলার কার্নিশ ছুঁয়ে উড়ে যাওয়া একটা পেঁচা। আমার মনে হল 'হুম্ হুম্' শব্দটা 'ওঁ ওঁ'।

গুমরানো কান্নায় ঘুমটা ভেঙে গেল। অক্ষমের হতাশার দীর্ঘশ্বাসের শীতল বাতাস যেন কোথা থেকে অন্ধকার ভেদ করে, জানলার ফাঁক দিয়ে, আমার স্বপ্নটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। অযুত জীবনের নিযুত ব্যর্থতার কালো কালো ধুলোর ঝড় যেন আমার শ্রান্ত দেহের ফাঁক ফোঁকরে এখনও ঘুঘুর বাসা বেঁধে রয়েছে। শ্লথ শিথিল অনিশ্চয়তায় জীবনটাকে ভাসাতে ভাসাতে, ভুলেই গেছিলাম আমি নারী। শুধু একটা রক্তমাংস দিয়ে গড়া কুমোরটুলির সাজানো প্রতিমা নয়।

আমারও একটা সত্ত্বা আছে।

আমারও একটা আত্মা আছে।

আছে আমার কোমল নারী মন।

সেই নারীত্বের পূর্ণতা কী এই অর্ধ সংসার জীবনে?

একটা অচেনা কান্নার দলা আমার গভীরের অলিন্দ-নিলয় থেকে উঠে এল। সেই কান্নার দলাটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগল আমার গলা বেয়ে, আমার সুষুম্নার ব্রহ্মনাড়ি ভেদ করে, স্পাইনাল কর্ড ছাড়িয়ে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে, স্মৃতির ভাণ্ডার অ্যামিগডালার অন্দরে। পৌঁছে গেল আমার ইমোশনের গোপন কুঠরিতে, আমার চেতনার অন্দরে, আমার গভীর আপনার নিজস্ব মন্দিরে - আমার একান্ত আপন আত্মার ট্রেজার চেস্টে। ভরা বর্ষার জিয়া ভেড়ালির মতো, পাহাড় থেকে লাফিয়ে নামা সুবনসিরির মতো, ভরা অন্ধকারে ঢাকা আমার নিজের ধ্রুবতারায় চলা মনটাকে এলোমেলো করে, ভেতরের ইমোশনকে আলুথালু করে, ভাসিয়ে দিল আরেক সংশয়ের দংশনে। ঘুমভাঙা জাগ্রত অবোধ মনটা আস্তে আস্তে ডুবে গেল এক তলহীন অন্ধকার ঘূর্ণীতে।

বিবস্ত্র আমি, হাউজ কোটটা জড়িয়ে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। অন্ধকার আকাশে ঝিকমিক করছে অজস্র তারা। সেই তারার আলোয় তৈরি হয়েছে এক অপূর্ব মায়াময় মূর্ছনা। কারা যেন হাজার হাজার সন্ধে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে সারা আকাশজুড়ে। কয়েকটি তারা সেই অন্ধকারের স্বপ্নলোকের সাগরে, এক এক করে জ্বালিয়ে দিচ্ছে ঝিকমিকে আলোর রংমশাল। দু-একটা বড়সড় তারা, ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে দেখছে এই অন্ধকারের বুকে অন্যান্য তারাদের সন্ধ্যারতি। কয়েকটা মেজো ধাঁচের তারারা, রজপুত্তুরের সঙ্গে সাধারণ মেয়ের উচ্ছল স্বপ্নবিহার দেখে, মিটমিট করে হেসে, ছিটিয়ে দিচ্ছে হাজার আলোর ফুলকির উলুধ্বনি। সেই দেখে, বাচ্চা তারাগুলো খিলখিল করে হেসে কুটিপাটি। নৌকোর চারপাশে দাপাদাপি করে, পুকুরপাড়ের উলঙ্গ শিশুদের মতো, ঝাঁপিয়ে পড়েছে আকাশগঙ্গায় স্নান করতে।

এতদিন পরে মৌনিস কি সেই সুরের রেশ নিয়ে নতুন ঝংকার বিটস?

'ওঁ ওঁ'

পেঁচার ডাকটার যেন নতুন মানে খুঁজে পাচ্ছি। গভীরের এক নতুন শব্দ মন্ত্রোচ্চারণে। পেঁচার ডাক আগেও শুনছি। কিন্তু এরকম তো কখনও মনে হয়নি। কোথায় যেন একটা শান্তির ওংকার ধ্বনি। স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে একটা যুগলবন্দি টানতে চাইছে। আমার দুচোখ বেয়ে নেমে এল এক আশ্চর্য কান্না।

কে যেন সেই কান্নার একটা নতুন ব্যাখ্যা দিচ্ছেঃ
নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্য

যত দিন গড়াচ্ছে, কান্নাটার মানে বুঝতে পারছি। লিভ-ইন পার্টনার হিসেবে মৌনিস খারাপ নয়। কাজ, রাতের সম্ভোগ, ফরেন ট্রিপ, সমস্ত সত্ত্বা জুড়ে দুনিয়াদারি। আমার প্রতি আকর্ষণটাও। সাংসারিক বন্ধনের বেষ্টনী ছাড়া আমার অস্তিত্ব নিছকই দৈহিক। আমার মানসিক দিকে উঁকি মারার সময় ওর নেই।

সম্পূর্ণ বাস্তববাদী।

সেখানে আমি একা।

একা অন্য।

পূর্ণ মাত্রায় ভাববাদী।

পাশাপাশি দুই নারী-পুরুষ এক ছাদের তলায় একসঙ্গে দিনের পর দিন কাটাচ্ছি একটা ক্ষীণ সুতোয় বাঁধা অস্তিত্বে। বিপরীত মেরুর টানাপোড়েনে। তাই বুঝি অগোচরে পেঁচাটার 'ওঁ ওঁ' শব্দ আমার চোখের জলের সান্ত্বনা। বুঝতে পারছি, নিছক প্রেমের আকর্ষণ, দেহের ঘর্ষণে, দুটি সত্ত্বা কখনও একই সুতোয় জীবনের মালা গাঁথতে পারে না। দুই বিপরীত মেরুর ব্যক্তি একই সুতোয় বাঁধা পড়লে অন্তরের দহন অনিবার্য। জৈবিক প্রেমকে কি মেলাতে চাইছি ঈশ্বর প্রেমে? নতুন মালা গাঁথতে গিয়ে বোকার মতো অসীমকে জড়িয়েছি সীমার বাঁধনে?

বছর না পার হতেই, স্বপ্ন ঘোর কেটে গেল বাস্তবের প্রখর দিবালোকে। সেই আলোক যেমন দহনে দগ্ধ করছে, তেমনই বন্ধন ছিন্ন করতে প্রেরণা জোগাচ্ছে। জীবাত্মা যদি পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের প্রয়াসী হয়, তবে মধ্যবর্তী কোনও প্রেম সেখানে বাসা বাঁধার অবকাশ নেই। জীবনের চলার পথে সেই মার্গে পৌঁছতে অন্য কোনও বন্ধনের আকাঙ্ক্ষা বৃথা তপস্যা।

এ পথ যে চলার পথ, থামার পথ নয়।

এ পথ যে চলার পথ, পেছন ফিরে দেখা নয়।

এ পথ যে আমার বাঁচার পথ, ধরে রাখার নয়।

বন্ধনে অতৃপ্তি।

স্বাধীনতাতে মুক্তি।

তার মধ্যেই শান্তি।

মুক্তি দিলাম মৌনিসকে আমার খেলাঘরের মায়াজাল থেকে। এখন খোঁজা নিজেকে অন্তরের অচেনা অন্ধলোকে। যেমন কোনও অন্ধ চিত্রকার হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ছবিটা দেখে।

অন্তর দৃষ্টির আলোকে।

একাকী, অন্যভাবে।

সাত

শূন্যে ঝুলছি। না পারছি বাস্তবে ফিরতে। না পারছি মহাশূন্যে পাড়ি দিতে। বাস্তব মহাশূন্যের টানাপোড়নে দিশাহারা।

আগে দ্বন্দ্ব ছিল মৌনিসের সঙ্গে চলাকে কেন্দ্র করে। এখন নিজের চলার ছন্দে।

মুকুলের বিকাশ প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই স্তব্ধ। কিন্তু এখনও ঝরে পড়েনি। মনের মাধুরী দিয়ে যে জীবন গড়তে নেমেছিলাম, বাস্তব মহাশূন্যের টানাপোড়নে দিশাহারা। দৃপ্ত বলিষ্ঠ উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে গিয়ে আমি জীর্ণ। আমার আমিতে অবরোহণের পর, আরোহণ করেও নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দেখি, তুলসীতালায় দিনের প্রখর আলোয় টিমটিম করে এখনও সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলছে। এখনও তা নিভে যায়নি। অন্তরের নতুন আলোর সন্ধানেই তো এতভাবে নিজেকে দেখার প্রচেষ্টা। নিজের বৈচিত্র্যকে আর্কাইভ থেকে বার করে স্ক্যন করতে রানিং ক্যসের রেজিস্ট্রিতে। কোন ডেডলি ভাইরাস বা ট্রজেন সেখানে বাসা বেঁধে আছে কি না ।

রবিবার। ছুটির দিন। বারান্দায় এসে বসলাম। অপারাহ্ন তখন পুরিয়া ধানেশ্রীর সুর শোনাচ্ছে। চেনা সুর নয়, তবুও বড্ড চেনা। সেই সুর একটাই মন্ত্র দিয়ে যাচ্ছে কানে কানে - সূর্য এখনও অস্ত যায়নি নিস্তেজ অপরাহ্নে। এখনও পাখিরা দিন শেষের রবির কিরণ ছুঁয়ে ফেরেনি নীড়ে। এখনও তারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মুখরিত নিজেদের কোলাহলে, অট্টরোলে। এখনও যা হয়নি সংগীত, হতে পারে কালকের গীত, আমারই চেতনার অনুরণনে। সেটাই সংগীত, সেটাই ছবি, সেটাই কাব্য, আমার চেতনা, আগামীর গীত।

তাকিয়ে ছিলাম পলাশ গাছটার দিকে। গাছের পাতাগুলো কেমন নিঃসাড়, প্রাণহীন, স্তব্ধ। বসন্তের আঙিনাতে। ঠিক আমারই মতো। সেখানে উবে যায় বিস্মৃত বকুল নব কলেবরের সৌরভে।

সেখানেই তো ফোটার কথা নব পল্লব,
কিশলয়ের জাগৃতিতে।
সেখানেই আছে অপরিচিত কুসুম সৌরভ
ফুলঝরা ওই বাগানে।
যেখানে অনাবিল স্নিগ্ধ শান্তি খেলে বেড়ায়
এই বিশ্ব চরাচরের বুকে।
যেখানে সব অনুভূতি মিশে যায়
ব্যথা ভরা চিরন্তন সুখে।
যেখানে স্থিত জাগ্রত জীবাত্মা।
সেখানেই প্রকাশ রংহীন পরমাত্মার,
নতুন চেতনার উন্মোচনে।

সূর্যাস্তের শেষ কিরণের দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। স্বাদ নেই, তবু একটা বর্ণ আছে। সে বর্ণটা অর্থহীন এখন আমার কাছে। সিগারেটের ধোঁয়াটায় সোয়াস্তি নেই, মুক্তি নেই, আরাম নেই। কুণ্ডলী পাকিয়ে বাষ্পে মিশে যাচ্ছে। সিগারেটটা বারান্দার বাইরে ছুড়ে দিতে গিয়ে চোখ পড়ল পলাশ গাছটার দিকে। শীত এখনও আসেনি। তবুও পাতাগুলো কেমন ঝরে ঝরে পড়ছে বসন্তের স্তব্ধতায়। ঝরা পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হল এটাই বসন্ত। সত্যিকারের জীবন। এখানে সবাই একা। ম্লান, প্রায় অবলুপ্ত অনুভূতিগুলো, স্তব্ধ বদ্ধতার মুখরতায়। চেনা রঙিন বসন্তের অচেনা আকারহীন ছবি। সেটাই তো সত্যের প্রতিমূর্তি।

আমার এখনকার আমি। অমিশ্রিত আমার স্বচ্ছ ছবি। মনের আয়নায় অনাড়ম্বর, আবেগহীন, শূন্যতার প্রতীক। আমার আসল আমি। র‍্যামের ক্যাস থেকে সব কিছু মুছে, আমার পিউরিফায়েড সেরিব্রাল

কম্পিউটারের অ্যামিগড্যলা দিয়ে সাজানো, একান্ত পরিপূর্ণতার ছবি।

পলাশের পাতাগুলো কেমন স্থির। একটুও কাঁপছে না। স্তব্ধ দ্বিপ্রহর বসন্তের আঙিনায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে। হয়ত সতেজ ফুলগুলো রং ভুলে নতুন রঙের প্রতীক্ষায়। স্তব্ধ বিস্ময়ে। রংহীন রঙের ফাগুয়ায়, আরেক সুর ভাঁজতে। নতুন আরেকটা ছবি। যা ঋতুরাজ চলে গেলেও মলিন হবে না ঋতুস্রোতের মহাপ্লাবনে। সেখানে হয়ত কোকিল ডাকবে নতুন কোনও সুরে। চিরবসন্ত আঁকবে মনে কাল। প্রবাহের রংহীন চিরশান্তির ছবি। সেখানে কোনও চেনা রং নেই। বাসন্তী, লাল সব মিলেমিশে একাকার এক অজানা মনের রঙের সংমিশ্রণে। ক্রমশ আকার নিচ্ছে অবচেতনে। মাধুর্য নিয়ে বিকশিত অচেনা চেতনার প্লাবনে।

রবিবারের অপরাহ্নে বারান্দায় বসে আর্কাইভ ভুলে চেতনা নিয়ে নাড়াচাড়া। গাছের পাতাগুলো হাওয়ার অভাবে স্তব্ধ বিস্ময় অপেক্ষা করছে, ডুবে যাওয়া রামধনুর রঙের নতুন রূপ দেখতে। তারই মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি নিজেকে।

কোনটা আমি?

থমকালাম।

একবার...

দুবার...

অনেক ক্ষণ ধরে

বার বার...

মনের মধ্যে ডুয়েল বিটস-এর লহরা বাজছে।

কোনও প্রচলিত মধুর রাগ নয়।

কোনও পরীক্ষিত স্তুতি নয়।

কোনও চেনা সুরের মাদল নয়।

এই ছন্দকে সময়ের ব্যাপ্তিতে, চিন্তার উর্বর বিন্যাসে, ক্রিটিকের দৃষ্টিতে, সুপ্ত ইমোশনের স্ফুলিঙ্গের দৃপ্তিতে, কোনও চেনা গতের কৃষ্টির মধ্যে বন্দি করা যায় না। আমার অন্তরের ডামাডোলের স্বাক্ষর।

একান্তই নিজস্ব।

এটাই আমি।

একা অন্য।

এখানেই আমার আকৃতি, প্রকৃতি, বিকৃতি। এখানেই আমি অমলিন। সদর্পে সীমাহীন। নিজের চেতনার উদ্ভাসে। এখানেই পরিপূর্ণ বর্ণহীন আমার আকার নিজেকে চেনায় প্রস্ফুটিত দৃপ্ত আলোকে। এখানেই আমার পূর্ণতা উজ্জ্বল, দ্বিপ্রহরের দিবালোকে। আপন মহিমায় আমি উদ্ভাসিত, মলিনতাহীন না-চেনা শ্লোকে।

আরেক কাপ চা নিয়ে আবার বারান্দায় এসে বসলাম। ক্রমশ অপরাহ্ণ ঢলে পড়ছে সান্ধ্য গাড়ি ধূলিতে। আস্তে আস্তে আকাশের আলো কমে যাচ্ছে। একটা দুটো করে তারা ফুটে উঠছে আকাশের ক্যানভাসে। রাতের আঁচল আস্তে আস্তে হাওয়ায় টানে ছড়িয়ে পড়ছে। ধীর পায়ে সন্ধ্যা নামছে। ক্লান্ত অবসন্নতার শিথিল আচ্ছাদন বিছিয়ে। আকাশের এ-ঘর, ও-ঘর, সে-ঘরের দরজা খুলে সব ঘরেই একটা একটা করে মৃদু তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিলাম তারাদের দিকে। বোধহয় কিছু খুঁজছি ওই আকাশে তারাদের কাছে। আমার দুচোখ হঠাৎই ভীষণ জ্বালা করে উঠল। চোখে জল এসে গেল। অব্যক্ত ব্যথায় ইচ্ছে হল মরে যেতে। জল ভরা চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টিতে, আধো অন্ধকারে মনে হল, এই অন্ধকার তো আমার আলোর পথের দিশারি হতে পারে। তারারাই আমায় দেখাতে পারবে আলোর নিশানা। আমার অবচেতনকে জাগ্রত করতে নতুন ধ্রুবতারার ঠিকানায়। শূন্যতাকে ভরাট করতে পারে পূর্ণতার মহিমায়।

গোধূলির শেষ রশ্মি তখন বিদায়বেলার শেষ আলোর আভা ছড়িয়ে ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। রাগ পূরবীর শেষ রেশটা টেনে দিচ্ছে অস্তগামী সূর্যের নিঃশেষ হয়ে যাওয়া আলোর দিগন্তে। বর্ণহীন অন্ধকার সেজে উঠছে নতুন বর্ণের আভরণে। কোথায় মিলেমিশে গেছে না-শোনা অন্তরের ঝংকারে। সেই ঝংকার শুনিয়ে যাচ্ছে, না দেওয়া পূজার মন্ত্রঃ

বরণ করি আমি তোমায়
আমার নিজের না পাওয়া
প্রদীপের পেছনে পড়ে থাকা
একান্ত নিভৃত অন্ধকারে।
তোমায় আমি গ্রহণ করি
আমার শেষ রাগিনীর
একাকী নিঃশব্দ ঝংকারে।
তুমি যেই হও না কেন তুমিই তো আমার পূজা।
তুমি যেই হও না কেন তুমিই আমার রাজা।
তুমি যেই হও না কেন তুমিই তো আমার তৃষা।

মনে হল, আমার সারা শরীরটা যেন ধীরে ধীরে গলে গলে মিশে যাচ্ছে এক অন্তহীন অতল গহ্বরে। আমার এতদিনের অস্তিত্বটা যেন ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে এক মহাশূন্যের অন্ধকারে।

ধ্রুবতারা খুঁজতে গিয়ে ধূমকেতুর মতো আমি নিক্ষিপ্ত মহাশূন্যে। এক অদৃশ্য পৃথিবীর দরজা খুলে গেছে। চারদিকে এক অনন্ত শূন্যের মহাসংগীত। আমি এখন অঙ্গীকারহীন রথে। যেখানে স্পুটনিক পৌঁছয় না। যেখানে স্পেস রিসার্চ স্তব্ধ। যেখানে চলার শুরুও নেই, শেষও নেই। থেমে গেছে ক্ষুদ্র পরমাণু থেকে বিশ্বজাগরণের চেতনায়। একটা ঘোর লাগা, হাল্কা কুয়াশার আবরণে চারদিক ঢেকে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ছোটবেলায় দার্জিলিঙের ম্যালে দেখা উত্থিত কুয়াশার রিপ্লে। সেই অনন্ত রশ্মির দিকে তাকালাম। বিস্ময়ে কান পেতে, অনন্তের গুঞ্জনে, নিস্তব্ধতার সমুদ্রে। অবাক হয়ে, নাক দিয়ে সেই অপার্থিব কুয়াশার ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করলাম। অবাক হয়ে মুখের মধ্যে জিভের ওপর সেই শব্দের স্বাদ, সারা শরীরের ত্বক দিয়ে, সেই প্রোজ্জ্বল আলোটাকে স্পর্শ করতে চাইলাম।

চারদিকে একটা মায়াময় আবরণ। প্রকৃতি যেন এক বিশাল কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আকাশ, বাতাস, শব্দ - সব মিলেমিশে যাচ্ছে এক অদ্ভুত জগতে প্রবেশ করার প্রস্তুতিতে। অভিনীত হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির এক অপূর্ব লীলা। অনুভূতির ষষ্ঠ মাত্রা আবরণ ভেঙে বেরিয়ে আসছে মহাবিশ্বের প্রথম উদ্ভাসে। তারই জন্মলগ্নে প্রকাশিত হচ্ছে রূপ রস শব্দ গন্ধ বর্ণ স্পর্শ - আদি জাগতিক চেতনা।

এযাবৎ তো কেউ শেখায়নি এই লীলার মাহাত্ম্য। অথবা সত্য। বুঝতেই পারলাম না, বিশ্বপ্রকৃতির এই অতি বিরল না বোঝা, না চেনা খেলা।

ব্রহ্ম দ্বার খুলে দিয়েছে স্তবের প্রথম মহামন্ত্রে ‘ওঁ’।

এক অনৈসর্গিক উল্লম্ব চেতনায় উড়ে চলেছি মহাকালের কোলে। দিগন্তের শেষ রেশ পেরিয়ে ক্রমশ হারিয়ে পার্থিব ব্যাপ্তির বাইরে। এটাই কী তূরীয় লোক? যার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হচ্ছে। যেখানে কোনও গণ্ডি নেই, ব্যাপ্তি নেই, শেষ নেই। কোনও শুরুও নেই। অনন্ত পথে নেমে পড়েছি মহাকালের হাত ধরে।

উত্তরণের পথে!

আমি আর অভিশ্রী নই। আমার রক্তমাংসের দেহটা গলে বাষ্প হয়ে গেছে। কিংবা অন্য এক এনার্জি হয়ে প্রস্ফুটিত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওই ঝরা পাতার মতো আমার পুরো অস্তিত্বটাই মহাশূন্যের সীমাহীন কালো গর্তের অতলে। আমার নশ্বর দেহ কী হারিয়ে যাচ্ছে মহাব্যোমের কালো গর্তে? আইনস্টাইন তো বলে কোনও কিছুই হারায় না। আত্মার মতোই অবিনশ্বর। সেই অবিনশ্বর সত্ত্বা গর্তের কোণে বসে রূপ পরিবর্তন করছে নতুনভাবে প্রকাশের জন্য।

এটাই কী মুক্তি?

নির্বাণলোক?

জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গম?

চেতনার বাস্তবিক ব্ল্যাক হোল?

হয়ত তাই। যারা সেই নির্বাণের অমৃতলোকে পৌঁছয়, তাঁরা তো ফেরে না নিজের অভিজ্ঞতা জানাতে। নির্বাণলোক তাই কল্পনায় ভরা ইহলোকে থেকে মুক্ত অন্য লোক।

মা, সৌরিক, রামগোপাল, মৌনিস তো ফেলে আসা ইহলোক।

এটাই কী স্বর্গলোক, অসীম?

জানি না।

কেউই বোধহয় জানে না।

চেনে না, সেই কল্পনার অমৃতলোক।

অজানা অসীম।

ক্রমে দেহটা হিমশীতল হয়ে যাচ্ছে পারদ রেখার বাইরে। আমি যেন আইনস্টাইনের ব্ল্যাক হোলে ক্রমশ মিশে যাচ্ছি আমার এতদিনের অস্তিত্বকে বিলীন নিশ্চিহ্ন করে।

তারপর?...

উত্তরণ

ক্রমশ যেন সেই কালো গর্তের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। এক অনৈসর্গিক কুয়াশায় এক এক করে হারিয়ে যাচ্ছে আমার জাগতিক দেহের অংশগুলো - আমার সুন্দর গলা, শাঁখের মতো কান, দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ি ঢেউয়ের মতো মাদক বুক, আমার মদির নাভি, আমার স্বপ্নিল নিতম্বের হারানো ছন্দ।

মুক্তির আগে শেষবারের মতো নিজেকে দেখলাম। আমার সে দৃষ্টির মধ্যে...

কোনও আমন্ত্রণ নেই...

কোনও বিসর্জন নেই...

কোনও ভড়ং নেই...

কোনও ছলাকলা নেই...

অনেক না-থাকার মধ্যেও কী যেন একটা রয়েছে। এমন কিছু, যা এর আগে কখনও অনুভব করিনি। স্থির দ্যুতিতে আমার চোখ দুটো উজ্জ্বল।

শুকতারার মতো জ্বলজ্বলে,

সন্ধ্যাতারার মতো শান্ত নিবিড় স্বপ্নিল।

স্বপ্নে দেখা রাজকন্যার রাজপুত্তুর নিয়ে রূপকথা।

পাখির নীড়ের চেয়েও অনেক বেশি স্নিগ্ধ।

আস্তে আস্তে আমি সেই স্নিগ্ধ অচেনা কুয়াশার মধ্যে গলে গলে মিশে যাচ্ছি। সরে যাওয়া মরীচিকার মতো দিগন্ত ছেড়ে শাশ্বত সত্যের ঊর্ধ্বলোকে।

অতীত হারিয়ে গেছে।

বর্তমান ধোঁয়া।

ভবিষ্যৎ কী, জানি না।

ধোঁয়া হওয়া আমার অস্তিত্বটা ধীরে ধীরে আইনস্টাইনের ব্ল্যাক হোলে প্রবেশ করছে। এক অচেনা, অজানা সুরঙ্গে। এক অকল্পনীয় রূপহীন অরূপ জগতের সিংহ দরজা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে মহাকালের পথ বেয়ে। অবাক হয়ে দেখলাম বিশ্বপ্রকৃতির এই আজব খেলা। সব সুর-তাল-লয় যেন বাঁধা পড়ে গেছে ইহকাল পার হয়ে চেতনা থেকে অতিচেতনে। এটাই কী তবে চেতনার বাইরে অধিষ্ঠিতির তূরীয়লোক?

যেখানে আলো নেই, তবু আলোর বন্যা।

যেখানে গন্ধ নেই, তবু সুগন্ধের ঝর্না।

যেখানে কেউ নেই, তবু যেন কার অমৃত স্পর্শে দেহ মন আনন্দে শিহরিত প্রতি পলে।

যেখানে স্তম্ভিত জাগ্রত মহাবিশ্ব বরণ করছে আমার সত্ত্বা, আমার আত্মাকে, পরম স্নেহে।

ফোটাতে নব-বসন্তের কুড়ি, মহাব্যোমের স্বর্গলোকে।

যেখানে কেবলই আমি।

একা অন্য।

সো অহং।

জাগরণ, স্বপ্ন, গভীর নিদ্রা চেতনার স্তরগুলো অতিক্রম করে আমার আত্মা বিশ্ব, তৈজস্য, প্রাজনার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তূরীয়লোকের মায়ায়। জাগতিক অনুভূতির ঊর্ধ্বে।

হরি ওঁ - মহাবিশ্বের ওঙ্কার ধ্বনি টাইম, স্পেসের, গণ্ডি অতিক্রম করে আমার ক্ষুদ্র নিরাকার আত্মায় প্রতিধ্বনিত।

আত্মাই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আত্মা।

অন্তরে বেজে চলেছে গভীর প্রণব ধ্বনি ‘ওঁ’।

অ্যাম্যাঞ্জি রিসর্টে সেই আত্মার জাগরণ সপ্ত সুরে, নবরসে, উনিশ প্রণালীতে। অগ্নি, জল, বায়ু, পৃথ্বী, স্থান, শক্তি সেই সপ্ত সুরের ছন্দ। প্রেম, বিস্ময়, ভয়, বীভৎস, রৌদ্র, বিক্রম, করুণা, হাস্য, শান্তির নবরসেই তার আনন্দ। মানস, চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধির সমন্বয়ে আমার অন্তঃকরণ। প্রাণ, আপন, সমান, উদান, ভ্যান পঞ্চ বায়ুর আবেশে বিচরণ। দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে উনিশ প্রণালীতে নিজের অবরোহণ।

অ্যাম্যাঞ্জি থেকে প্রকৃতি দর্শনে। বিশ্ব চরাচরের মধ্যে নিজের উন্মোচনে। অষ্টমাঙ্গিক মার্গে তৈজস্য স্বপ্নে আরোহণ। চৈতন্যর দৃষ্টি বিনিময়ে প্রেমে দ্বন্দ্ব। জ্বলেছি একাকী নিভৃতে দহন অগ্নিতে মুক্তির পথে। গভীর সুপ্তিতে আচ্ছন্ন সত্ত্বা চেতনার অপরিবর্তিত রূপে। আইনস্টাইনের ব্ল্যাক হোলে। উৎসর কেন্দ্রবিন্দুতে...

এখন আমার...

বাহির নেই।

এখন আমার...

অন্তর নেই।

এখন আমার...

কিছুই নেই।

ভালো নেই...

মন্দ নেই...

আলো নেই...

অন্ধকার নেই...

শব্দ নেই...

বর্ণ নেই...

গন্ধ নেই...

স্বাদ নেই...

স্পর্শ নেই...

হারিয়ে গেছে মহাকালের গর্ভে।

হারিয়ে গেছে কালপ্রবাহের অনন্তে।

এখন শুধু মহা ওঙ্কারধ্বনি পূর্ণ মিলনে। জাগরণ, স্বপ্ন, গভীর নিদ্রা মিলেছে মহাজাগতিক নৈঃশব্দ্যে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

সৃষ্টি, স্থিতি,প্রলয়।

অতীত, বর্তমান,ভবিষ্যৎ।
অবচেতন, চেতন, অতিচেতন।
একাকার...
মহাব্যোমের অনৈসর্গিক ব্যপ্তিতে। মধুর মিলনে মহা ওঙ্কারধ্বনিতে।
সৃষ্টির আদি কম্পনে...
কসমিক এনার্জির অনাহত নাদে।
অধিষ্ঠিতির অনাবিল শান্তির প্লাবনে।
পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম মধুর মিলনে।
পরম প্রশান্তিময় দ্যুলোকে।